Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সিরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমী ফেরদৌসী

রোলঃ 227020573

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সিরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমী ফেরদৌসী

রোলঃ 227020573

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সিরাহ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমী ফেরদৌসী, আইডিঃ 227020573 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সিরাহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সুমী ফেরদৌসী

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সুমী ফেরদৌসী

আইডিঃ 227020573

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

সীরাহর সঙ্গা........ 4

সীরাহ অধ্যায়নের প্রয়োজনীয়তা 7

তৎকালীন আরবের বিভিন্ন রাজ্য ও নেতৃত্ব প্রসঙ্গ........ 18

ইয়ামান সম্রাজ্য........ 18

৩০০খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে ইয়ামানী ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত 20

আরবের রাজনৈতিক অবস্থা........ 22

আরবের ধর্ম ও ধর্মীয় মতবাদ........ 23

পিতার দিক থেকে নবীজির বংশধারা 34

মায়ের দিক থেকে নবীজির বংশধারা........ 34

রাসুল সাঃ এর নামসমূহ........ 35

নবীজির দৈহিক বর্ননা 39

নবীজি সাঃ এর বক্ষবিদারন........ 40

বকরি চরানো,সকল নবীর পেশা 42

খাদিজা রাঃ এর সঙ্গে বিবাহ........ 46

অনন্য খাদিজা রাঃ 47

কাবা পুননির্মান........ 49

নবীজির কন্যাগন........ 51

নবীজির অন্যান্য স্ত্রীগণ 53

নবুয়াত লাভ 57

ওহী বন্ধ 61

পুনরায় ওহী সহ জিব্রাইলে আঃ এর আগমন 62
স্ত্রী দের সাথে যেমন ছিলেন তিনি 65
নবীজির দিনলিপি 68
নবীজির রমাদ্বান 71
রাসুল সাঃএর উপর নির্যাতন 81
অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত লোকেদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা 85
প্রথম হিজরত:আবিসিনিয়া 90
মক্কার সাহসী সাহাবীরা 93
দুঃখের বছর 101
ইসরা ও মিরাজ 103
আকাবার প্রথম শপথ 108
আকাবার দ্বীতিয় শপথ 110
মদীনায় হিজরত 111
সাওর থেকে মদিনায় 114
গাজওয়া 118
সারিয়া 118
গাজওয়ায়ে বদর 118
গাজওয়ায়ে উহুদ 122
হুদায়বিয়ার সন্ধি 127
বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে নবীজির চিঠি 128
খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের ইসলাম গ্রহন 129
খায়বার যুদ্ধ 129
কাজা উমরা আদায় 129
মক্কা বিজয় 130

হুনাইন যুদ্ধ..132

তায়েফযুদ্ধ 133

বিদায় হজের ভাষণ..136

জীবনসায়াহ্নে রাসূল 138

বিদায় এর সন্ধিক্ষণে রাসূল..139

দাফন কাফন 143

শেষ কথা...147

গ্রনহ পনিজকা...147

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على نبينا محمد

হে আল্লাহ, আপনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি বইয়ের ভাষায় কিছু কথা উপস্থাপনের তাওফিক দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। বলতে, শুনতে, অনুসরণ করতে,কিংবা লিখতে সর্বোপরি এই নেয়ামাহ থেকে বঞ্চিত হতে চায়বে এমন কেউ কি আছেন মালিকের পৃথিবীতে !সুবহানআল্লাহ, অবচেতন মনে ও কখনো কেউ বঞ্চিত হতে চায়বেনা হয়তো।তিনি কি? তিনি রাব্বে কারিমের হাবীব,বিশ্বজগতের মহামানব,রহমাতুল্লিল আলামীন আমাদের আদর্শ। আজ প্রতিনিয়ত চোখ মেললেই দেখা যায় সর্বত্রই অনিয়মের বেড়াজালে নিয়মগুলোর বন্দীদশা, এই অনিয়ম থেকে বেড়োতে আমাদের একটাই পথ, রাসূলের সীরাহ অনুসরন করা। আল্লাহ সুবহানুওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে নিজেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ সুবহানুওয়া তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে পবিএ কুরআনে ঘোষণা করে দিয়েছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

[সুরা আহযাব: ২১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর প্রতিটা কাজই ছিল তাঁর উম্মাহর জন্য আদর্শ। দুনিয়া ও আখিরাতে একমাত্র মুক্তির পথই ছিল রাসূলুল্লাহ সাঃ এর আদর্শকে অনুসরণ করা।

আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআলা এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وذكر الله كثيرا

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

যারা আল্লাহ এবং আখেরাত দিবসের প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, তাদের জন্য।"
[সুরা আহযাব: ২১]

নব্য জাহেলিয়াতের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টাতে কুরআন সুন্নাহ ছারা মানুষের এই অন্ধকার থেকে মুক্তির আর কোনো পথ নাই। কুরআন সুন্নাহভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দর্পন যদি আমরা দেখতে চায়, তাহলে রাসূল (সাঃ) এর পূর্নাঙ্গ জীবনব্যাবস্থাটাকেই জানতে হবে। আয়েশা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে সত্য ও যথার্থ বলেছেন,

فَإِنْ خُلُقَ نَبِي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنِ» یک

তিনি বলেছেন, কুরআনই ছিল আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র। (সহিহ মুসলিম ৭৪৬, সুনানে আবু দাউদ ১৩৪২।)

নবীজি (সাঃ) এর পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাটাই ছিল অত্যন্ত সম্মানের এবং মর্যাদার। কিভাবে আল্লাহ সুবহানুওয়া তায়ালা নবীজিকে শক্তিশালী করলেন কিভাবে তাঁকে কিতাব শিক্ষা দিলেন, কিভাবে বিজয় দান করলেন অনেক শক্তিশালী বিশাল শত্রু দলের বিরুদ্ধে। কত জাহেলিয়াত, কত ফিতনা ফাসাদের মধ্যে কিভাবে তিনি রবের দ্বীনের বিজয়ের জন্য পুরোটা জীবনকেই বিলিয়ে দিয়েছেন, সুবহানআল্লাহ এই সবকিছুর মাঝে রয়েছে অনেক নিদর্শন যা কেবল নবীজির জীবনী জানার মাধ্যমেই আমরা জানতে ও অনুভব করতে পারি। নবীজির জীবনী লিখতে, বলতে, গিয়ে অনেকে

অনেক সময় অনেকে বাড়াবাড়ি ভাবে লিখেন কিংবা উপস্থাপন করেন। রব আমাদের সে বিষয় থেকে হেফাজত করুন এবং একে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

সীরাহর সঙ্গা

সীরাহ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পথ বা রাস্তা। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হেঁটে যাওয়াকে আরবিতে বলা হয় সাইরতু ফুলান অর্থাৎ অমুক হাঁটছেন। আরবিতে সাইর অর্থ হচ্ছে হাঁটা। হেঁটে যাওয়ার জন্য পথের প্রয়োজন। সীরাহ বলতে এমন একটা পথকে বোঝায় যেটার উপর একজন ব্যক্তি তাঁর জীবনের পুরোটা জুড়েই হেঁটে চলে।হান্স ডিকশনারি তে সীরার অর্থ দেয়া হয়েছে আচার ব্যবহার, চলাফেরা, জীবনযাত্রার ধরন প্রতিক্রিয়া, কাজকর্মের ধরন, সামাজিক অবস্থা, সবগুলাই হচ্ছে সিরাহ এর অন্তর্ভুক্ত। সিরাহ বলতে শুধুমাএ রাসুল সাঃ এর জীবনীকে বোঝানো হয় বিষয়টি এমন নয়। যে কোনো ব্যাক্তির জীবনচরিত বোঝাতে সীরাহ শব্দটি ব্যাবহ্রত হয়। সীরাহ শব্দটি দেখলেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামটি প্রথমে চলে আসে এর কারণ, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনী তে সবচেয়ে বেশি বার সীরাহ শব্দটি ব্যাবহার করা হয়েছে । এজন্য রাসুল(সাঃ) এর জীবনী বোঝাতে অধিকাংশ ক্ষেএে সীরাহ শব্দটি ব্যাবহ্রত হয়। তবে উমার (রাঃ), আবু বকর(রাঃ) তাঁদের জীবনী কে আবু বকর(রাঃ), উমাার (রাঃ) সীরাহ বললেও ভূল হবেনা।সীরাহ বলতে যে কোনো ব্যাক্তির জীবনচরিত কেই বোঝানো হয়।

নবীজির সিরাহ কেন পড়বো? এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে পক্ষে একশো টা উত্তর থাকলেও বিপরীতে একটা উত্তরও পাওয়া যাবে না হয়তো। একজন মুসলমানের মুমিন হওয়ার, সিরাত্বল মুস্তাকিমের পথে চলার স্বপ্ন সার্বজনীন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার সিঁড়ি বা পথের নাম ই হলো   সিরাহ। নবীজীকে জানার জন্য আমাদের নবীজির সিরাহ পড়তে হবে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে নবীজি(সাঃ) সম্পর্কে আমরা কেনো জানবো?নবীজীকে না জানলে আমরা তাঁকে পরিপূর্ণ রূপে ভালোবাসতে পারবো না। আর নবীজিকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসতে না পারলে আমরা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবনা।আল্লাহ সুবহানুওয়া তায়ালা পবিএ কোরআনে ৫০ টির ও অধিক আয়াতে নবীজি সম্পর্কে জানার ও চেনার জন্য বলেছেন।নবীজিকে ভালোবাসা ঈমানের ও আলামত।

রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার কাছে আমি তার পিতা-মাতার চেয়ে, সন্তানাদির চেয়ে এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে প্রিয় না হব(বুখারী,হাদীস ১৫)

একটি ঘটনা এভাবে বর্নিত আছে রাসূল (সাঃ) কে উমার রাঃ একবার বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি আমার কাছে সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় কেবল আমার জান ছাড়া।

রাসুল(সাঃ) বললেন, না এ কথা সত্য নয়, কসম সেই সত্বার যার হাতে আমার প্রাণ এটা ওই সময় পর্যন্ত সত্য নয় যতক্ষণ না আমি তার জানের চেয়েও বেশি প্রিয় হব। রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর থেকে এই কথা শুনে উমার (রাঃ) তখনি বললেন সেই সত্তার কসম আপনি আমার জানের চেয়ে বেশি প্রিয়, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বললেন এতক্ষণে তোমার ঈমান পূর্ণ হল (সহীহ বুখারী, হাদিস ৬৬৩২)

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, নবীর উপর মুমিনদের জানের চেয়ে বেশি হক আছে (সূরা আহযাব, আয়াত ৬)

রাসুল সাঃ কে জান মালের চেয়ে বেশি ভালোবাসা না পর্যন্ত আমাদের ঈমান পূর্ণ হবেনা।তাঁকে ভালোবাসা ঈমানের ই অংশ যারা রাসূল সাঃ কে ভালোবাসে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানুওয়া তায়ালা পবিএ কুরআনে ঘোষণা করেন তারা আল্লাহর দল, মনে রেখো নিশ্চয়ই আল্লাহর দলের লোকেরাই সফল (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত ২২)

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে যিনি তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন, অল্প কিছু সময় পরে যিনি তাঁর মাকে ও হারিয়েছেন, সাবালক হওয়ার পূর্বে যিনি হারিয়েছেন প্রিয় চাচাকে, সব সময় কষ্টটা পরিমাণে বেশি পেয়েছেন আপনজনদের কাছ থেকে, পুরো জীবদ্দশায় সবচেয়ে বেশি অপমানিত হয়েছেন, মানুষের কাছে শুনেছেন কটু কথা, দুবেলা কখনো জোটেনি পেট ভরে খাবার জীবনের অধিকাংশ অবস্থায় থেকেছেন ঋণগ্রস্ত। মানসিক সামাজিক শারীরিক আর্থিক একটা মানুষের জীবনের যত ধরনের

কষ্ট আসতে পারে সবকিছুই যাঁর জীবনে ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের, মৃত্যুর পূর্বেও নিজের ঢালটি এক ইহুদির কাছে রেখে খাবার আনতে হয়েছিল যাঁকে,সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানব হয়েও সবচেয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যিনি,সবর আর শোকরের মোড়কে মোড়ানো ছিল যাঁর জীবদ্দশা, শত শত কাফিরও মুগ্ধ হয়েছেন যাঁকে দেখে, এসেছেন ইসলামের ছায়াতলে,যাঁর জীবনী মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরেও একই সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিটি মুমিন মুসলিমের অন্তরে, সেই তিনিই আমার প্রাণের নবী,আপনার প্রানের নবী (সল্লাল্ললহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাঁকে না জেনে থাকি কি করে আমরা যিনি না দেখেও ভালোবেসে গিয়েছেন আমাদের কে,আকাঙ্খা রেখেছেন আমাদের সাক্ষাতের।

রাসূল তাঁর সাহাবিদের বলতেন, "আমি আমার ভাইদের দেখার আগ্রহ অনুভব করছি।'
সাহাবিরা বললেন, 'আমরা কি আপনার ভাই নই?'

রাসূল সাঃ জবাব দিলেন, 'তোমরা আমার সাহাবি। আমার ভাই হচ্ছে তারা - যারা আমাকে না দেখেও আমার প্রতি ইমান আনবে, আমার সত্যায়ন করবে, আমার অনুসরণ করবে।সুবহানআল্লহ
আজ এই সময়ে এসে আমরা সবচেয়ে আপডেটেড মানুষ টাকে অনুসরন করে আপডেটেড হওয়ার চেষ্টায় মত্ত হয়ে আছি,যেই আপডেট আমাদের কে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে যেটার দৌরাত্ম্য মৃত্যু পর্যন্তই শেষ। অথচ মুমিনদের আপডেট তো জান্নাত পর্যন্ত। অথচ এমন সময়ে এসে আমরা আমাদের আদর্শ কে ভূলে যাচ্ছি,যিনি ছিলেন সর্বযুগেই সব সময়ের সবার চেয়ে বেশি আপডেটেড মহামানব। যেই সময়টার কথা স্বয়ং রাসুল(সাঃ) বলে গিয়েছেন।রাসুল (সাঃ)বলেছেন,

মানুষের উপর এমন একটি যুগের আগমন ঘটবে, যখন তার পক্ষে ধর্মের উপর ধৈর্য্য ধারন করে থাকাটা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ব্যক্তির মতো কঠিন হবে।
তিরমিজি: ২২৬০

সীরাহ অধ্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

১/সরাসরি রবের নির্দেশ

রাসুল(সাঃ) এর সীরাহ সম্পর্কে জানাটা শুধুমাএ শখের বিষয় নই বরং স্বয়ং আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা পবিএ কোরআনে এ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অর্থঃ যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর সাঃ মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (সুরা আল আহযাব, ৩৩:২১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (সূরা আন নিসা, ৪:৫৯)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থঃ বলে দাও, হে মানব মন্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তাঁর রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং

তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রান্ত হতে পার। (সূরা আল আরাফ, ৭:১৫৮)

২/কুরআন কে বুঝতে

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সময় সংঘটিত বিষয় গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল, সেগুলোর প্রকৃত প্রেক্ষাপট সীরাহ অধ্যায়ন ছারা বোঝা সম্ভব নয়।যেমন খন্দকের যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূরা আহযাবের অধিকাংশ আয়াত নাযিল হয়েছিল,আবার সূরা আল ইমরানের কিছু অংশ জুড়ে মুসলিম খ্রিস্টানদের মধ্যে কথোপকথন আর পরবর্তী কিছু অংশে রয়েছে উহুদ যুদ্ধের বিবরণ। কিন্তু এগুলোর পূর্নাঙ্গ বিবরণ সূরা গুলোতে পাওয়া যায় না। যা কেবল সীরাহ অধ্যায়নের করার মাধ্যমেই কেবল পরিপূর্ণ ভাবে জানা যায়। আখেরাত সম্পর্কিত আয়াত যেগুলো স্বতন্ত্র, সীরাহ অধ্যায়নেই যেগুলো ব্যাপকভাবে জানা সম্ভব।

৩/রাসুল(সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি

সীরাহ অধ্যায়ন করলে আমরা জানতে পারি,রাসুল সাঃ কেমন ছিলেন।তাঁর মহানুভবতা, তাঁর নীতিনৈতিকতা, তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কোরবানি, শিষ্টাচার,তাঁর ইবাদাতের পদ্ধতি, সুবহানআল্লাহ।দিনের পর দিন নির্যাতিত হয়েছেন কাফেরদের দ্বারা,তবু ও কিভাবে দ্বীনের বিজয়ের জন্য নিজের সর্বস্ব বাজি রেখেছেন, পিতা হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন,স্বামী হিসেবে কেমন ছিলেন, কেমন ছিলেন তিনি প্রতিবেশীদের সাথে,নেত্রীত্বে কেমন ছিলেন তিনি,সবকিছু কেবল সীরাহর মাধ্যমে জানতে পারি। নবীজি (সাঃ) এর গোটা জীবনী ছিলো মুগ্ধতা ছড়ানো যত বেশি জানা যায় ততই উনার প্রতি কেবল ভালোবাসা, মুগ্ধতা বৃদ্ধি পায়। আর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসার ফায়দাটাও হলো অবর্ণনীয়। সব প্রেমিকের জন্যই রয়েছে সুসংবাদ।আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসার সুসংবাদ স্বয়ং রাসুল (সাঃ) দিয়েছেন। রাসুল (সাঃ) সালাম বলেছেন

মানুষের হাশর নাশর তার সাথেই হবে যাকে সে ভালোবাসে।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক সাহাবী রাসূলের দরবারে এসে জিজ্ঞেস করেন কেয়ামত কবে? রাসূল (সাঃ) তখন জিজ্ঞেস করলেন তুমি এর জন্য কি কি প্রস্তুতি নিয়েছো? সাহাবী বললেন আমি অধিক পরিমাণে নামাজ, রোজা, যাকাত , সাদকাহ,আদায় করে কোন প্রস্তুতি নিতে পারিনি কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমার ভালোবাসা আছে। তখন রাসুল (সাঃ)বললেন তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালোবাসো (সহীহ বুখারী হাদিস ৬১৭১) সাহাবী তখন বললেন আমি এত খুশি হয়েছি ইসলাম গ্রহণের পরেও আমি এত খুশি হতে পারিনি। পবিত্র কুরআনে সূরা নিসাতে আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা বলেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ

أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্যে থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম।(সূরা নিসা,৬৯)

হযরত আনাস রাঃ বলেন আমি আল্লাহর রাসূল(সাঃ) কে দেখেছি,তিনি লাউ পছন্দ করতেন তারপর থেকে আমার ও লাউ ভালো লাগতে শুরু করে। রাসূল(সাঃ) এর পছন্দ, কথাবার্তা, কাজকর্ম তাঁকে পুরোপুরি অনুসরণ করাটাও তাঁকে ভালোবাসারই অন্তর্ভুক্ত। সীরাতের আলোচনা করা, সিরাত পাঠ্য দান করা তাঁর উম্মাতের প্রতি ভালোবাসা, তাঁকে ভালোবাসারই নিদর্শন, তাদেরকে সুপথে ডাকা তাদের প্রতি আন্তরিক থাকা তাঁর প্রতি ভালোবাসারই নিদর্শন।

৪/হাদিস বুঝতে সহায়ক

রাসুল (সাঃ) এর জীবনের খন্ডিত বর্ণনা গুলো হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআন বোঝার সাথে সাথে হাদিস বুজতেও সিরাহ জানা জরুরি। হাদিসের বিধান, হাদিসের শিক্ষা এগুলো জানার জন্য সিরাহ অধ্যায়ন করা জরুরি।

৫ /উত্তম আখলাকের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে

সীরাহ অধ্যায়ন করলে জানা যায় কেমন চরিত্রের অধিকারী ছিলেন রাসুল সাঃ) । অনেক কথা তিনি কিভাবে অল্প কথায় ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর কথা সাহাবীরা এমনভাবে শুনতেন যেনো তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে। তিনি নিরর্থক কোনো কথা বলতেন না।সবাই তাঁর কথায় মুগ্ধ হয়ে যেতো।

৬/রবের প্রতি তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি

রাসুল সাঃ এর পুরো জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়,তাঁর পুরোটা জীবন ই কেটেছে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু তিনি কখনো তাওয়াক্কুল হারাননি। যত পরীক্ষা এসেছে তাঁর তাওয়াক্কুল না কমে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। না খেয়ে থেকেছেন,কাফেরদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন,তবুও তিনি অবিচল থেকেছেন রবের প্রতি তাওয়াক্কুল এতটুকু ও কমেনি।একবার এক অভিযানকালে, রাসূল (সাঃ) একটি গাছের নিচে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন, সাহাবীরা তাঁর থেকে কিছুটা দূরে ছিল। তখন এক শত্রু এসে রাসূল সাঃ এর তরবারি তুলে নিয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয় এবং জিজ্ঞেস করে, "আমার হাত থেকে এখন

তোমাকে কে বাঁচাবে?" রাসূল (সাঃ) খুব শান্তভাবে উত্তর দেন, "আল্লাহ"। এই জবাব শুনে সেই শত্রুর হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়।

৭/ইসলামের ইতিহাস জানতে সহায়ক

রাসুল(সাঃ) এর পুরো জীবনটাই ইসলামের ইতিহাস। দুনিয়াতেই জান্নাতের সুখবরপ্রাপ্ত আশরা ই মুবাশশারাহর ১০ জনের একজন ছিলেন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস। তাঁর পুত্র মোহাম্মদ ইবনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বলেন, আমাদের পিতা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পরিচালিত যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন তিনি আমাদেরকে রাসুলের সিরাহ পড়ানোর সময় বলতেন এগুলো হলো তোমাদের বাপ দাদাদের ঐতিহ্য। আলী ইবনে আবি তালিবের নাতি আলি ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব বলেছেন, আমাদেরকে যেভাবে কুরআন শেখানো হয়েছিল ঠিক সেভাবেই সীরাহ শেখানো হতো। এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে কোরআন অধ্যায়নের পেছনে তাঁরা ঠিক সেভাবে সময় ব্যায় করতেন। সীরাহ অধ্যায়নের পেছনেও তাঁরা ঠিক সেভাবে সময় ব্যয় করতেন। রাসুল (সাঃ) জীবনী তাই শুধুমাত্র

শখের বসে জানার বিষয় নয়,সীরাহ মুসলমানদের ইতিহাস,ইসলামের ইতিহাস।সীরাহ মূলত রাসুল(সাঃ) এর জন্মের ঘটনা থেকে শুরু না হয়ে তাঁর আগমনকালীন সময়ের বিশ্বের পরিস্থিতির আলোচনা নিয়েই শুরু হয়। সীরাহর প্রতিটি গ্রন্থে দেখা যায় যে বিশাল একটি পরিচ্ছদ ই আছে তৎকালীন আরব ও বিশ্বের সমসাময়িক অবস্থা জানার জন্য।

তৎকালীন আরবের ইতিহাস

আরব শব্দটি বালুকাময় প্রান্তর, ঊষর ধূসর মরুভূমি বা লতাগুল্ম তৃণ ও শস্যবিহীন অঞ্চল অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক পূর্ব থেকে বৈশিষ্ট্যগত অর্থে আরব উপদ্বীপ এবং সেখানে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের জন্য এই পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়।সমগ্র ভূভাগের আয়তন ১০ লক্ষ থেকে ১৩ লক্ষ বর্গমাইল। আরবের চতুর্দিকে মরুভূমি, দিগন্ত বালুকাময় প্রান্তর দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার কারনে বিদেশী শক্তি বা অন্য বহিশএুর দ্বারা এখানে আক্রমন করা, এই ভূখন্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করা অত্যন্ত কঠিন। আরবের পশ্চিমে লোহিত সাগর ও সিনাই উপদ্বীপ, পূর্বে আরব সাগর ও দক্ষিণ ইরাকের এক বড় অংশ এবং দক্ষিণে আরব সাগর যা ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত অংশ উত্তরের সাম্রাজ্য এবং উত্তর ইরাকের কিছু অংশ।

আরব সম্প্রদায়সমূহ: জন্মসূত্রের ভিত্তিতে ইতিহাসবিদগণ আরব সম্প্রদায়সমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা:

১. আরবে বায়িদাহ এঁরা হল ঐ সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন গোত্র এবং সম্প্রদায় যা ধরাপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এদের খোঁজ খবর সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণাদির সন্ধান লাভ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে যথাক্রমে আদ, সামূদ, ত্বাসম, জাদীস, ইমলাকু, উমাইম, জুরহুম, হাযুর, ওয়াবার, আবীল, জাসিম, হাযারামাওত ইত্যাদি।

২. আরবে আরিবা: এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত গোত্র যারা ইয়াশজুব বিন ইয়া'রুব বিন ক্বাহতানের বংশোদ্ভূত। এদেরকে কাহতানী আরব বলা হয়।

৩. আরবে মুস্তা'রিবা: এঁরা হচ্ছেন ঐ আরব সম্প্রদায় যারা ইসমাঈল (৪৪)-এর বংশধারা থেকে আগত।

এদেরকে 'আদনানী আরব বলা হয়। আদনানীদের বংশধারা থেকেই রাসুল (সাঃ) এর জন্ম হয়েছে।প্রতিটি সীরাহর গ্রন্থে নবীজির বর্ণনা থেকে লেখক গন সিরাহ লেখা শুরু করেন না বরং ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এর সময় থেকে শুরু করে থাকেন।মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নবীজির বংশধারা শুরু। ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ছিলেন ইরাকের উর অঞ্চলের বাসিন্দা। এ শহরটি ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত। ওই শহরের ভূগর্ভ খনন কালে শহর সম্পর্কে নানা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্বের বংশধরগণ এবং তখনকার বাসিন্দা গণের সামাজিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায়। ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে হার্রান শহরে আগমন করেন সেখান থেকে আবার ফিলিস্তিনে পৌঁছান এবং সে দশকে নবুয়্যাত লাভ করেন। আল্লাহ সুবহানাতায়ালা তাঁকে সম্মানিত "খলিলুল্লাহ" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁর উপর রেসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেন। সেখান থেকে দেশের অভ্যন্তরীন সম্প্রচার এবং প্রসারের জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করেন। এক সময় ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিশরে স্ত্রী সারার সাথে পৌঁছান। তখনকার মিশরের বাদশা ছিলেন ফেরাউন। ফেরাউনের মন্ত্রীর মুখে সারাহর রূপ গুণের বর্ণনা শুনে ফেরাউন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা চালান। বিবি সারাহ এ ঘটনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা তা কবুল করেন এবং তার ফলস্বরূপ ফেরাউনের হাত পা বিকারগ্রস্থ করে দেন ফলে সে হাত পা ছোড়াছুড়ি করতে থাকে। তার হাত-পা নাজেহাল এবং জর্জরিত হয়ে যায়। সে উপায় না পেয়ে নতো হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে সারাহ কোন সাধারণ নারী না বরং তিনি রবের বিশেষ রহমত প্রাপ্ত কোনো বান্দী।এতেও সে ক্ষান্ত না হয়ে সারাহর রূপে গুনে মুগ্ধ হয়ে তার কন্যা হাজেরাকে সারাহর খেদমতে নিয়োজিত করেন। বিবি হাজেরার খেদমতে মুগ্ধ হয়ে সারাহ তাঁর স্বামী ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর সঙ্গে হাজিরার বিবাহ দেন। ইব্রাহিম সারাহ এবং হাজেরাকে নিয়ে নিজের বাসস্থান ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর আল্লাহ সুবহানাতায়ালা হাজেরার গর্ভে ইব্রাহিম আলাই

সাল্লাম এর সন্তান দান করেন। বিবি সারাহ তখন সংকোচ ও লজ্জিত বোধ করে তাদের বনবাসে যাওয়ার জন্য চাপ প্রদান করতে থাকেন।ভিন্ন বর্ণনায় আছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম স্বপ্নে এ নির্দেশ পান ফলে তিনি বিবি হাজেরা ও শিশু পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে ইজাজ ভূমিতে এসে পৌঁছান। তারপর কাবা শরীফের নিকট অনাবাদি ও শস্যহীন উপত্যকায় পরিত্যক্ত এক স্থান তাঁদের রেখে দেন। ওই সময় বর্তমান আকারের বায়তুল্লাহর কোন অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমানে যেখানে বায়তুল্লাহ অবস্থিত সে সময় সেই স্থানের আকার ছিল একটি উঁচু ঢিলার মত। কোন সময় বৃষ্টির সৃষ্টি হলে ডান কিংবা বাম দিক দিয়ে সেই বৃষ্টির ধারা বয়ে চলে যেত। সে সময় জমজম কূপের পাশে হারামের উপরিভাগে বিরাট একটা গাছ ছিল। ইব্রাহিম আলাইহিওয়া সাল্লাম স্ত্রী হাজেরা এবং শিশু পুত্র ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই গাছের নিচে রেখে যান। সেখানে কোন মানুষের বসতি ছিল না, ছিলো না কোন পানির উৎস। ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পাত্রে কয়েকটি খেজুর এবং ছোট্ট একটি মশকে করে পানি রেখে উল্টো পথে হাঁটা আরম্ভ করে আবার ফিরে যান সেই ফিলিস্তিনে। বুঝতে পেরেছিলেন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁদেরকে রেখে যাবেন। কিন্তু তিনি বোঝেননি এমন জনমানবহীন মরুভূমির মাঝে তাঁদেরকে এভাবে রেখে চলে যাবেন। তিনি ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছু পিছু গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন আপনি কি আমাদের এখানে রেখে চলে যাচ্ছেন এখানে তো কোন জনবসতিও নেই। না আছে কোন ফল ফসল।ইব্রাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে রইলেন । হাজেরা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার প্রশ্ন করলেন, তিনি এবারো কোন উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার যখন জিজ্ঞেস করা হলো তখনও তিনি উত্তর দিলেননা। যখন হাজেরা আলাইহি ওয়া সালল্লাম প্রশ্ন করলেন, তবে কি আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন, তখন তিনি উত্তরে বললেন হ্যাঁ। হাজেরা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মন থেকে তখনই দুশ্চিন্তা বিদায় নিল কারণ তিনি জানতেন যত নিরিবিলি যত মরুভূমিময় স্থানই হোক না কেন আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা রহমতের চাদরে তাঁদেরকে ঠিকই আবৃত করে রাখবেন। ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের রেখে চলে গেলেন। অনেক দূরে যাওয়ার পরে যখন শিশুপুত্র ইসমাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বিবি হাজেরা কে আর দেখা যাচ্ছিল না তখন তিনি কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর কাছে চমৎকার একটি দোয়া করেন।যা সূরা ইব্রাহিমে বর্নিত হয়েছে,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ لا الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাঁদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাঁদেরকে রিযকনপ্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে'।(সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ৩৭)

ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলেন। মা হাজেরার কাছে যে খাবার ছিল তা কয়েক দিনের মাঝেই শেষ হয়ে গেল। ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো দুধের শিশু। তিনি তাকে বুকের দুধ পান করাচ্ছিলেন। একসময় দুধও শুকিয়ে গেলো।ইসমাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনবরত কান্না করতে থাকলেন। সন্তানের কান্না সহ্য করতে না পেরে হাজেরা আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের খোঁজে বের হলেন। প্রথম একটি পাহাড় বেয়ে উপরে উঠলেন, এ পাহার পরে আস- সাফা নামে পরিচিত হয়েছিল। সেই পাহাড়ের উপরে উঠে একবার ডানে তাকান আবার বামে তাকান কিন্তু কাছাকাছি কোন মানুষের সন্ধান পেলেননা।এরপর পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকায় ফিরে এলেন।তারপর কাপড় জড়োসড়ো করে আরেকটি পাহাড়ে উঠতে লাগলেন,পাহাড়টি আল -মারওয়া নামে পরিচিত হয়। সেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ও কাউকে দেখতে পেলেন না, এদিকে পুত্র ইসমাইল প্রচন্ড ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে, অন্যদিকে মা হাজেরা কিছু পাওয়ার আশায় সাফা মারওয়ার মাঝে সাতবার উঠানামা করে ফেলেছেন। সপ্তমবার তিনি যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন শব্দটি কোথা থেকে এসেছে সেটা অনুধাবন করার জন্য এদিক ওদিক তাকালেন। হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন শিশু ইসমাইলের পায়ের কাছ থেকে আসছে। আল্লাহ সুবহানাওয়াতায়ালার নির্দেশে জিব্রাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে জমজম কূপ খনন করে দিয়েছেন। মরুভূমি শুষ্ক জায়গা তাই সেখানকার পানি শুকিয়ে যেতে পারে এটা ভেবে তিনি কুয়ার মত খনন করে পানি সংরক্ষণ করার কথা চিন্তা করলেন। এটা বর্ণনা করার সময় রাসূল (সাঃ) বলেন ইসমাইলের মায়ের উপর আল্লাহ সুবহানা তায়ালা রহম করুন। তিনি যদি এটা না করতেন তাহলে সেখানে নদী হয়ে যেত। রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম হাজেরার এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় বলেন এ কারণে আমরা সাফা মারওয়ায় উঠানামা করি হজের সময়।হাজেরা আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি

জানতেন যে এমন এক সময় আসবে যে সারা বিশ্বের মুসলমানরা তাঁকে অনুসরণ করবে, তাহলে হয়তো তিনি সে সময়ে মুখে হাঁসি নিয়েন সাফা মারওয়াতে উঠানামা করতেন। এই ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পায় যে, যত কঠিন পরিস্থিতির শিকার আমরা হয় না কেন আমাদের তাওয়াক্কুল ঠিক রেখে আমরা যদি সবর করতে পারি তাহলে তার প্রতিদান কতই না অসাধারণ হয়,সুবহানআল্লাহ। কিছুদিন পর ইয়ামান থেকে এক গোত্রের লোকজনেরা সেখানে আগমন করে।এ গোত্রকে জুরহুম সানি বা দ্বিতীয় জুরহুম বলা হয়। ইসমাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাতার অনুমতি নিয়ে মক্কা ভূমিতে অবস্থান করতে থাকেন এই গোত্র। পরিত্যক্ত স্ত্রী, পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাতে আগমন করেন কিন্তু তিনি কতবার মক্কাতে আগমন করেছেন তার বিবরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে অধিকাংশের মত ছিল তিনি চারবার আগমন করেছিলেন। ইসমাইল যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন জুরহুম গোত্র থেকে আরবি ভাষা উত্তম রূপে আয়ত্ত করেছিলেন এবং সব দিক দিয়ে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। এরপর কিছু সময়ের মধ্যে এই গোত্রেরই এক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, ততদিনে বিবি হাজেরা ইন্তেকাল করেন। এদিকে পরিত্যক্ত পরিবারের কথা স্মরন করেই ইব্রাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় মক্কাতে যাত্রা করেন কিন্তু পুত্র গৃহতে না থাকায়,পুত্রবধুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং সেখানে কথাবার্তার এক পর্যায়ে পুত্রবধূ সাংসারিক অসচ্ছলতার অভিযোগ জানান অভিযোগ পেশ করলে ইব্রাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপদেশ প্রদান করেন ইসমাইল আলাইহিস সাল্লাম আগমনের পরে যেন দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে নেন, পিতার উপদেশের তাৎপর্য অনুধাবন করে ইসমাইল আঃ তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।এই মহিলা ছিলেন জুরহুম গোত্রের আমর বিন উমরের কন্যা। ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় বিবাহের পর পুনরায় মক্কায় আগমন করেন কিন্তু প্রথমবারের মতো এবারও তাঁর পুত্রের সাথে সাক্ষাৎ হয় না।পুত্রবধুর সাথে সাক্ষাৎের একপর্যায়ে কুশলাদি জানতে চাইলে, পুত্রবধু আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌকাঠ স্থায়ী রাখার পরামর্শ দেন এবং পুনরায় ফিলিস্তিনের অভিমুখে যাত্রা করেন।ইসমাইল (আঃ) জমজম কূপের বৃক্ষের নিচে তীর তৈরি করছিলেন,ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় আবার মক্কায় আগমন করেন। এমতাবস্থায় পিতা কে দেখতে পেয়ে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং

কোলাকুলি, আলিঙ্গন করে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন এটা ছিল সবার জন্যই অত্যন্ত আবেগপূর্ণ একটি ঘটনা। ওই সময় পিতা পুত্র একত্রিত হয়ে কাবা গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেন। আল্লাহ তায়ালা মুয়াজের কন্যার গর্ভে ইসমাইল আলাই সাল্লাম এর মোট ১২ টি সুসন্তান দান করেন। ইসমাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ১২ সন্তান থেকে পরবর্তীতে ১২টি গোত্রের সূত্রপাত হয়, সবাই মক্কা নগরীতে এবং আরব এর বাইরে ও বসতি স্থাপন করেন। মক্কা নগরীর পুণ্যভূমিতেই কায়দার বিন ইসমাইলের বংশবৃদ্ধি হয় এবং কালের পরিক্রমায় সেখানে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আহরণ করেন। তারপর কালচক্রের আবর্তনে আবার অজ্ঞাত ও অক্ষত হয়ে পড়ে। সেই স্থানে আদনান এবং তার সন্তানদের অভ্যুদয় ঘটে, আদনানী গণের বংশপরম্পরা বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষিত আছে।আদনান হলো নবী করীম(সাঃ) বংশ তালিকার ২১ তম উর্ধ্বতন পুরুষ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)'র সন্তানাদির মধ্য থেকে ইসমাঈল (৪) কে, ইসমাঈল (আঃ) (৪)-এর সন্তানাদির মধ্যে থেকে কিনানাহকে মনোনীত করেন। কিনানাহর বংশধারার মধ্য থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেন।

ইবনে 'আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং আমাকে সর্বোত্তম দলভুক্ত করেন। তারপর গোত্রসমূহ নির্বাচন করা হয় এবং এক্ষেত্রেও আমাকে সর্বোত্তম গোত্রের মধ্যে শামিল করা হয়। তারপর পারিবারিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করা হয় এবং এক্ষেত্রেও আমাকে অত্যন্ত মর্যাদাশীল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতএব, আমি আমার ব্যক্তিসত্তায় যেমন উত্তম

মর্যাদার ব্যাপারেও তেমনি সব চেয়ে উত্তম। আদনানের বংশধর গণ যখন বেশি সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকলো তখন জীবিকার সন্ধানে
তারা আরব ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।
বনু হানিফা বিন সাব বিন আলী বিন বাকর গোত্র ইয়ামামাহ অভিমুখে গমন করেন এবং তার কেন্দ্রস্থল হুজুর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। বাকর বিন- ওয়াইল এর

অবশিষ্ট শাখা সমূহ ইয়ামামাহ থেকে বাহরাইন, সাইফে কাযীমাহ, বাহর,সওয়াদে ইরাক, উবুল্লাহ এবং হিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।বনু তাগালিব গোএ ফোরাত উপদ্বীপ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।বনু সুলাইম গোএ মদিনার নিকটবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করেন। বনু আসাদ বসতি স্থাপন করেন তাইমার পূর্বে ও কুফার পশ্চিমে। বনু জুবায়ের বসতি স্থাপন ও আবাদ করতেন তাইমার নিকটে হাওরানের পাশে। বনু কিনানার গোত্রের লোকজন থেকে যায় তুহামায়। এদের মধ্য থেকে কুরাইশগণ বসতি স্থাপন করেন মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে। এরা এক একজন একেক রকম ধ্যান-ধারণার অধিকারী ছিল কোন নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না তাদের ভেতরে। এভাবে তারা জীবন যাপন করছিল। তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন কুসাই বিন কিলাব এবং সঠিক পরিচালনা করে অর্থ মর্যাদা সম্মানের আসনে উন্নীত করে বিজয়ী করেন।

তৎকালীন আরবের বিভিন্ন রাজ্য ও নেতৃত্ব প্রসঙ্গ

নবী (সাঃ) এর দাওয়াতের পূর্বে আরবে দুই প্রকারের রাজ্য শাসন প্রচলিত ছিল।
এক মুকুট পরিহিত সম্রাট কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিল না
দুই গোত্রীয় দলনেতা অন্যান্য গোত্রেরও একই মর্যাদা ছিল মুকুট পরিহিত সম্রাটের ন্যায়।কিন্তু বেশিরভাগের বৈশিষ্ট্য ছিল তারা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। শাহানে ইয়ামান, শাহানে আলে গাসসান (শামরাজ্য) শাহানে হীরাহ(ইরাক) এ সকল সাম্রাজ্যে মুকুটধারী সম্রাটের প্রশাসন কায়েম ছিল। অবশিষ্ট অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ছিল গোত্রীয় জননেতা শাসন।

ইয়ামান সম্রাজ্য

আরবে আদিবার অন্তর্ভুক্ত যে সম্প্রদায় প্রাচীন ইয়েমান সম্প্রদায় হিসেবে ছিল তারাই ছিল সাবা সম্প্রদায় এর অন্তর্ভুক্ত। উর বর্তমান ইরাক ভূখণ্ডের ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের ধ্বংসস্তূপ থেকে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে খ্রিস্টপূর্ব আড়াইহাজার বছর পূর্বে সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতকে তাদের সূচনা হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।
গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তাদের জীবনযাত্রা নিম্নরূপ

খ্রিস্টপূর্ব ৬২০ অব্দ থেকে ১১৫ অব্দ পর্যন্ত

এ সময় কাল তাদের রাজত্বকে সাবা সম্রাজ্য বলা হত ।সাবাহ সম্রাট গন রাজা বাদশা উপাধি গ্রহণ করেন এবং মুকাররাব উপাধি পরিত্যাগ করেন সারওয়াহ এর পরিবর্তে মায়ারিবকে সাম্রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা দেন।

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ থেকে ১১৫ অব্দ পর্যন্ত

এ সময় তাদের রাজত্বকে প্রথম হিম ইয়ারী বলা হয়। কারণ সাবা গোত্রের উপর হিময়ার গোত্র প্রাধান্য লাভ করে। তারা তখন মায়া রিবের পরিবর্তন করেন রায়দান কে রাজধানী করেন পরে রাজধানীর নাম রায়দান পরিবর্তন করে জিফার রাখা হয় মূলত তখন থেকে সাবা সম্প্রদায়ের পতন শুরু হয়। রুমিগণ মিশর শাম এবং হিজাজের

উত্তর অঞ্চল দখল করে নেয়ায় সমুদ্রপথে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে কাহতানি গোত্র সমূহ নিজেদের মধ্যে কলহে লীপ্ত হয়ে আবাসস্থল পরিত্যাগ করে নানান দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

৩০০খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে ইয়ামানী ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত

এ সময়ের রাজত্ব কে বলা হয় দ্বীতিয় হিমইয়ারী। এসময় ইয়ামানে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা চলতেই থাকে, একের পর এক বিপ্লব ও যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে ফলে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ইয়ামানের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যায়।পক্ষান্তরে রুমিগণ এডেন দ্বীপে সমাবেশ করে তার ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপরে নিজেদের মধ্যেকার কলহের সুযোগ নিয়ে হাপসিগঞ্জ রুমি গোত্রের সহায়তায় তাদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন ৩৪০ খ্রিস্টাব্দে।হাবশীগনের দখলদারীত্ব স্থায়ী থাকে ৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ইয়ামানের স্বাধীনতা সে সময় এক প্রকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল, কিন্তু মায়ারিবের মশুর বাঁধে ফাটল দেখা দেয়। সেই ফাটল ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং একসময় ভেঙে যায়। এবং ভয়াবহ প্লাবনের সৃষ্টি হয় যার উল্লেখ কোরআন শরীফে সূরা সাবাতে আছে, এ প্লাবনের ফলে অনেক গ্রাম উজার হয়ে যায় এবং অনেক গোত্র বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটে। সম্রাট যূ নওয়াস নাজরানের খ্রিস্টানদের উপরে নেক্কারজনক আক্রমণ পরিচালনা করেন,খ্রিষ্টান থেকে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু খ্রিস্টানরা এতে সম্মত হয় না তাতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেন এবং খ্রিস্টানদের সেই আগুনে নিক্ষেপ করেন। সূরা বুরুজের শেষের দিকের আয়াতের এই নির্মম ঘটনার ব্যাখ্যা আছে। এ ঘটনার ফলে রুমীয় সম্রাটগনের নেতৃত্বে খৃষ্টান গন আরব উপদ্বীপের শহর ও নগরের উপর বারবার আক্রমণ চালিয়ে বিজয়ী হতে থাকেন। এতে উৎসাহিত হয়ে ইহুদীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা একতাবদ্ধ হন। এবং আক্রমণে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য হাবশীগণকে সরবরাহ করা হয়। রুমীগনের সহায়তায় হাবশীগন শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং পুনরায় ইয়েমানের উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং গভর্নর হিসেবে কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু আবরাহা বিন সাবাহ আল আশরাম নামে তার অধীনস্থ এক সৈনিক ৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে হত্যা করে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে খুশি করেন। তিনি ছিলেন সেই আবরাহাহ যিনি কাবা গৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বিশাল হস্তি বাহিনীসহ অভিযান পরিচালনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষী বাহীনি দ্বারা পরাস্হ হন।যে ঘটনা কুরআনে আসহাবে ফীল নামে প্রসিদ্ধ আছে। আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনার পর সনআা ফিরে আসার পর তাকে ধ্বংস করেন।তারপর তার পুএ ইয়াকসুম সিংহাসন

প্রাপ্ত হন যিনি তার পিতার চেয়েও খারাপ ছিলেন, ইয়ামানবাসীকে নিপীড়ন করে অতিষ্ঠ করে ফেলেন।পরবর্তী তে ইয়ামানবাসী পারস্য সম্রাজ্যের সাহায্য পুষ্ট হয় এবং হাবশীগনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইয়ামানবাসীগন সাইফ বিন যূ ইয়াযান হিময়ারীর সন্তান মাদীকারবের নেতৃত্বে হাবশীগনকে সে দেশ থেকে বিতারিত করে মাদীকারবকে সম্রাট মনোনীত করেন। মাদীকারব কিছু হাবশীকে নিয়োজিত করেন নিজের খেদমতে। হাবশীগন মাদীকারবকে হত্যার মাধ্যমে এ শাসনব্যাবস্থার ইতি টানেন।এরপর পারস্য বংশোদ্ভূত কয়েকজন গভর্নর ইয়ামান প্রদেশের শাসন পরিচালনা করেন। অবশেষে সর্বশেষ পার্সী গভর্নর বাযান ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহন করলে ইয়ামান পারস্য শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামি শাসনের ছায়াতলে আসে।

আরবের রাজনৈতিক অবস্থা

আরব উপদ্বীপের তিন দিকের সীমান্তবর্তী দেশসমূহের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই অস্থিতিশীল। বিশৃঙ্খলতা ,সমাজের জনগোষ্ঠী ছিল হয় মনিব, নয়তো দাস ,হয় রাজা না হলে প্রজা। মনিব রাজা দলপতি যে যে উপাধিতে থাকুক না কেন সুযোগ-সুবিধা ছিল বহিরাগত নেতাদের জন্য। কিন্তু দলের নেতাদের জন্য সমগ্র সুবিধার, আরাম, আয়েশ, জীবন ভোগের সমস্ত উপকরণ এর যোগানদাতা ছিল জনগণ।উপার্জনের সমস্ত উৎস ছিল প্রজারা। আর সেগুলো নিজেদের ভোগ-বিলাসে খরচ করতেন রাষ্ট্রনায়ক। আর তার সাথে বর্ষিত হতে থাকতো তাদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন। স্বৈরাচারী শাসন বলতে যা বোঝায় তা ছিল আরবের গোএগুলোতে। একদম অসহায় ছিল প্রজারা। আরবের অভ্যন্তরে যে সকল গোএ বাস করত তাদের জীবনেও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করতো। তাদের গোত্রের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ফ্যাসাদ, ধর্মীয় মতবিরোধ, বংশগত শত্রুতা লোকজন সর্ব অবস্থায় তাদের নিজেদের গোত্রকে সাপোর্ট করে আসতো। যেমনটা তাদের মুখপাত্র বলেছিল

وما أنا إلا من غزية إن غوت ** غويت، وإن ترشد غزية أرشد

'আমিও তো গাযিয়া গোত্রের একজন। যদি সে ভ্রান্ত পথে চলে তবে আমিও ভ্রান্ত পথে চলব এবং যদি সে সঠিক পথে চলে তবে আমিও সঠিক পথে পরিচালিত হব।

আরবের ধর্ম ও ধর্মীয় মতবাদ

ইসমাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত ও প্রচারের ফলে আরবে সাধারণ জনগণ ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনেরই অনুসারী ছিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তারা আল্লাহর একত্ববাদ এবং দ্বীন শিক্ষার কিছু অংশ ভুলে যেতে থাকেন এবং উদাসীন হয়ে পড়েন ।এত কিছুর মাঝেও দ্বীন ইসলামের কিছু অংশ তাদের মাঝে অবশিষ্ট থেকে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত খুযাহ গোত্রের সরদার আমর বিন লুহাই মানুষের সামনে এসে উপস্থিত না হন। তিনি ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন বিধায় সাধারন জনগন তাকে আলেমদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে তার অনুসরন করতে থাকেন। রাসুল (সাঃ) এর জন্মের আনুমানিক ৫০০ বছর পূর্বে আরবে প্রথম মূর্তিপূজার সূচনা হয়, আমর বিন লুহাই এর হাত ধরে। আমর বিন লুহাই একবার মক্কা থেকে সিরিয়া ভ্রমণ করেন সেখানে গিয়ে তিনি আমালেক সভ্যতার মানুষের সাথে পরিচিত হন। সেই সময় আমালেক সভ্যতা ছিল সবার শীর্ষে।আমর বিন লুহাই দেখলেন যে তারা মূর্তি পূজা করে, সে তাদেরকে মূর্তি পুজা করার কারন জিজ্ঞেস করলে তারা জানায় যে এই মূর্তি তাদের শক্তির উৎস। যখন তারা খরা বা দুর্ভিক্ষে পতিত হয় তখন মূর্তির কাছে সাহায্য চাই। মূর্তি তখন অলৌকিক ভাবে তাদের সাহায্য করে থাকে। এ কথা শুনে আমর বিন লুহাই খুবই উৎসাহিত হয়ে তাদের কাছে একটি মূর্তি চায়, তারা হুবাল নামক মূর্তিটি আমর বিন লুহাই কে উপহার দেয়। আমার বিন লুহাই হুবাল নামক মূর্তি নিয়ে মক্কায় ফিরে এসে কাবা ঘরের সামনে স্থান দিয়ে সবাই কে মূর্তি পুজার আদেশ দান করে। এটি কুরাইশদের প্রথম মূর্তি ছিল। আরবের লোকজনের মূর্তি পূজা মূলত হুবালের মাধ্যমে শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে এটি ছড়িয়ে পড়ে তারা এর সাথে সহযোগী আরো মূর্তি তৈরি করে নেয় । হুবালের জনপ্রিয়তায়,আরবে মূর্তি পূজার এত ব্যাপকতা লাভ করে যে ,এই ঘটনার আনুমানিক ৫৫০ বছর পর উহুদের যুদ্ধে যখন সাহাবীদের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়, তখন আবু সূফিয়ান চিৎকার করে বলে ওঠে,

হুবালের জয় হোক হুবাল জিতে গেছে। এ কথা শুনে রাসূল(সাঃ) উমার (রাঃ) কে বললেন তার কথার জবাব দাও, উমার(রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন আমি কিভাবে জবাব দিব, রাসূল(সাঃ) বললেন তুমি বলো আল্লাহ আমাদের রক্ষা কর্তা এবং তোমাদের কোন রক্ষা কর্তা নেই।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

رَأَيْتُ عُمَرُو بْنَ عَامِرِ بْنِ لَتى الخراعِي يَجُرُّ قَصَبَهُ [أَي أَمْعَاءَهُ] في النار(

"আমি আমর বিন লুহাইকে জাহান্নামের মধ্যে তার নাড়ি-ভুড়ি টানতে দেখেছি।" কেননা 'আমর বিন লুহাই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনে পরিবর্তন আনয়ন এবং মূর্তির নামে চতুষ্পদ জন্তু উৎসর্গ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।"

আরববাসীগণ মূর্তিকে কেন্দ্র করে এতসব কিছু করত এ বিশ্বাসে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভে এরা তাদেরকে

সাহায্য করবে। যেমনটি কুরআন কারীমে বলা হয়েছে যে,]٣ : مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا [الزمر ﴿إِلَى اللهِ الْقَى﴾ (মুশরিকগণ বলত) 'আমরা তাদের 'ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর

নৈকট্যে পৌঁছে দেবে।" (আয-যুমার ৩৯। ৩)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ لهؤلاء شفعا ولا عند الله :
"আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে 'ইবাদাত করে এমন কিছুর যা না পারে তাদের কোন ক্ষতি করতে, আর না পারে কোন উপকার করতে। আর তারা বলে, 'ওগুলো আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী।" (ইউনুস ১০:

তারা মূর্তিপূজার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের রীতিনীতি অনুসরণ করত। মূর্তিকে তাওয়াফ এবং সিজদা করত, তাদের সামনে অত্যন্ত ভক্তি ও বিনয়ের আচরণ করতো। মূর্তির জন্য বিভিন্ন প্রকারের মানত করতো কোরবানি করতো। মূর্তি পূজা করতো আল্লাহর নৈকট লাভের উদ্দেশে। খাদ্য পানীয়র কিছু অংশ উৎপাদিত শস্য ও কিছু মূর্তির জন্য রাখতো আবার কিছু আল্লাহর জন্য ও রাখতো।এক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, তারা যেগুলো আল্লাহর নামে রাখতো সেগুলো মূর্তির জন্য উৎসর্গ করত, কিন্তু মূর্তির জন্য রাখা জিনিস তারা কখনো আল্লাহর নামে নামে উৎসর্গ করতো না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন

وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة له كورنا والحرم على أزواجنا وإن يكن مينة لهم فيه شركة (الأنعام[١٣٩

'তারা আরো বলে, এ সব গবাদি পশুর গর্তে যা আছে তা খাস করে আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, আব আমাদের স্ত্রীলোকনের জন্য নিষিদ্ধ, কিন্তু তা (অর্থাৎ গর্ভস্থিত বাচ্চা) যদি মৃত হয় তবে সকলের তার অংশ আছে। তাদের এ মিথ্যে রচনার প্রতিফল অচিরেই তিনি তাদেরকে দেবেন, তিনি বড়ই হিকমারওয়ালা, সর্বজ্ঞ।" (আল-আন'আম ৬। ১০৯)

কথিত আছে কাবা শরীফ বিজয়ের পূর্বে হারাম শরীফের ভেতরেই ৩৬০ টি মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল।

তৎকালীন আরব সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বসবাস করত। অভিজাত শ্রেণীর আর নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের জীবনযাত্রার মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল পার্থক্য। অভিজাতশ্রেণীর পুরুষ এবং মহিলা গণের পারস্পারিক সম্পর্ক ছিল মর্যাদা এবং ন্যায়ের উপরে। অনেক বিষয়ে মহিলাদের স্বাধীনতা ছিল।,তাদের গুরুত্ব দেয়া হতো, তলোয়ার পর্যন্ত নিয়ে বেরিয়ে পরতো, এমনকি বর্শা নিয়ে খুন খারাবী ও হয়ে যেতো, নারীগণের সম্মান রক্ষার্থে। তখন আরবে পুরুষ শাসিত সমাজ ছিল এত কিছুর মাঝে ও।পরিবারের প্রধান হিসেবে ছিলেন পুরুষগন। তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। পারিবারিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্র বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতো। বর কনে উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো। অভিভাবক গনের অনুমতি ব্যাতীত নারীগনের অগোচরে বিবাহের অনুমতি ছিল না।পক্ষান্তরে নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের খুবই নিম্নচোখে দেখা হতো। দাসদাসীরা তো অবর্ণনীয় কষ্টে জীবনযাপন করতো। নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের জন্য এমন সব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যাকে ব্যাভিচার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত অন্ধকার যুগে আরব সমাজ বিবাহের চারটি প্রথা প্রচলিত ছিল এর মধ্যে একটি হচ্ছে যা বর্তমান যুগেও জনসমাজের প্রচলিত রয়েছে। এ প্রথা মোতাবেক বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে একজন তার অধীনস্থ মহিলার অন্যজনের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতেন। তারপর উভয় পক্ষে স্বীকৃতি লাভের পর বর কন্যাকে মোহর ধার্য করে বিয়ে করত ।

নারী-পুরুষের মিলনের দ্বিতীয় প্রথাকে বলা হতো 'নিকাহে ইসতিবযা"। নারী-পুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য থাকত জ্ঞানী, গুণী ও শক্তিধর কোন সুপুরুষের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সন্তান লাভ। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যখন কোন মহিলা ঋতু জনিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতেন তখন তাঁর স্বামী তাঁকে তাঁর পছন্দ মতো কোন সুপুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠাতে বলতেন। এ অবস্থায় স্বামী তাঁর নিকট থেকে পৃথক হয়ে থাকতেন, কোন ক্রমেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতেন না। এদিকে স্ত্রী প্রেরিত প্রস্তাব স্বীকৃতি লাভ করলে গর্ভ ধারণের সুস্পষ্ট আলামত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে থাকতেন। তারপর গর্ভ ধারণের আলামত সুস্পষ্ট হলে তাঁর স্বামী যখন চাইতেন তার সঙ্গে মিলিত হতেন। হিন্দুস্থানী পরিভাষায় এ বিবাহকে 'নিয়োগ' বলা হয়।

তথাকথিত 'বিবাহ' নামক নারী-পুরুষের মিলনের তৃতীয় প্রথা ভিন্নতর রূপের একটি জঘণ্য ব্যাপার। এতে দশ থেকে কম সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল একত্রিত হতো এবং সকলে পর্যায়ক্রমে একই মহিলার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতো। এর ফলে এ মহিলা গর্ভ ধারণের পর যথা সময়ে সন্তান প্রসব করত। সন্তান প্রসবের নারী-পুরুষের মিলনের দ্বিতীয় প্রথাকে বলা হতো 'নিকাহে ইসতিবযা। নারী-পুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য থাকত , গুনী ও শক্তিধর কোন সুপুরুষের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সন্ধান

লাভ। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যখন কোন মহিলা ঋতু জনিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতেন তখন তাঁয় স্বামী তাঁকে তাঁর পছন্দ মতো কোন সুপুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠাতে বলতেন। এ অবস্থায় স্বামী তাঁর নিকট থেকে পৃথক হয়ে থাকতেন, কোন ক্রমেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হবেন না। এদিকে স্ত্রী প্রেরিত প্রস্তাব স্বীকৃতি লাভ করলে গর্ভ ধারণের সুস্পষ্ট আলামত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে থাকতেন। তারপর গর্ভধারণের আলামত সুস্পষ্ট হলে তাঁর স্বামী যখন চাইতেন তার সঙ্গে মিলিত হতেন। হিন্দুস্থানী পরিভাষায় এ বিবাহকে নিয়োগ' বলা হয়।

তথাকথিত বিবাহ' নামক নারী-পুরুষের মিলনের তৃতীয় প্রথা ভিন্নতর রূপের একটি জঘণ্য ব্যাপার। এতে দশ থেকে কম সংখ্যক বাক্তির সমন্বয়ে একটি দল একত্রিত হতো এবং সকলে পর্যায়ক্রমে একই মহিলার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতো। এর ফলে এ মহিলা গর্ভ ধারণের পর যথা সময়ে সন্তান প্রসব করত। সন্তান প্রসবের

কয়েক দিন পর সেই মহিলা তাঁর সঙ্গে যাঁরা সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের সকলকে ডেকে নিয়ে একত্রিত করতেন। প্রচলিত প্রথায় বাধ্য হয়েই সংশিষ্ট সকলকে সেখানে উপস্থিত হতে হতো। সেখানে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে অমত করার কোন উপায় থাকতনা। মহিলার আহবানে যখন সকলে উপস্থিত হতেন তখন সকলকে লক্ষ্য করে মহিলা বলতেন যে, 'আপনাদের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ার ফলেই যে আমার এ সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে এ ব্যাপারটি আপনারা সকলেই অবগত আছেন।'

তারপর সমবেত লোকজনদের মধ্য থেকে এক জনকে লক্ষ্য করে বলতেন 'হে অমুক, আমার গর্ভজাত এ সন্তান হচ্ছে আপনারই সন্তান। মহিলার ঘোষণাক্রমে সন্তানটি হতো তাঁরই সন্তান এবং অবশিষ্ট সকলেই এর স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য থাকতেন।

নারী-পুরুষের বিবাহ ও মিলন' নাম দিয়ে আরও একটি জঘন্য রকমের অশ্লীল রিওয়াত জাহেলিয়াত যুগের আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। এতে মহিলাকে কেন্দ্র করে বহু লোক একত্রিত হতেন এবং পর্যায়ক্রমে তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন। কাজেই, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন লোক তাঁদের নিকট আগমন করলে তাঁরা আপত্তি করতেন না। এঁদের বাড়ির প্রবেশ দ্বারে প্রতীক হিসেবে নিশানা দিয়ে রাখা হতো যাতে ব্যক্তিরা নির্দ্বিধায় গমনাগমন করতে পারেন। যখন কোন মহিলা সন্তান প্রসব করতেন তখন তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী সকল পুরুষকে একত্রিত করা হতো। তারপর যে ব্যক্তি মানুষের অবয়ব প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে সেখানে আহবান জানানো হতো। সেই বাক্তি উপস্থিত সকলের অবয়ব নিরীক্ষণায়ে তাঁর বিবেচনা মতো এক জনের সঙ্গে সন্তানটির যোগসূত্র বা সম্পর্ক স্থাপন করে দিতেন। তিনি বলতেন, 'এ সন্তান

আপনার। যাঁকে লক্ষ্য করে এই রায় দেয়া হত, তিনি শিশুটিকে তাঁর ঔরসজাত সন্তান বলেই মনে করতেন।

বর্তমান সমাজ ব্যাবস্থায় যে বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা রাসুল(সাঃ) কর্তৃক প্রচলিত ব্যাবস্থা,তিনি আরব সমাজে আল্লাহর হুকুমে সে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। জাহিলিয়াতের সময়ে একইসঙ্গে অনেকগুলো বিবাহের নিয়ম ছিল যা পরবর্তীতে চারটার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করে দেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنهُ كانَ فَاحِشَةً ومَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حَرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنْتُكُمْ وَأَخَوتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَلخَلْكُمْ وَبَنت الأخ وبلك الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا

قد سلف إن الله كانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) [سورة النساء٢٢، ٢٣ :

'যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষ বিয়ে করেছে, সেসব নারীকে বিয়ে করো না, পূর্বে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল, অতি ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পন্থা। তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা এবং মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগিনী, দুধ মা, দুধ বোন, শ্বাশুড়ী, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সঙ্গত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত মেয়ে যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, কিন্তু যদি তাদের সাথে তোমরা সহবাস না করে থাক, তবে (তাদের বদলে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই এবং (তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং এক সঙ্গে দু' বোনকে (বিবাহ বন্ধনে) রাখা, পূর্বে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (আন-নিসা ৪: ২২-২৩)

কন্যা সন্তানদেরকে তারা পাশবিক নির্যাতন করত, এমনকি তাদের হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করত না দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের ভয়ে কন্যাদের হত্যা করতে ও তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।।

وقل تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُم ألا تشركوا به شيئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إملائي نحنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [الأنعام[١٥١ :

'বল, 'এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পড়ে শোনাই, তা হচ্ছে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যব্যাবহার কর, দরিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমিই তোমাদেরকে আর তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি, প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করো না। এ সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে কাজ কর।' (আল-আন'আম ৬। ১৫১)'

মানুষদের সাথে পশুর মত ব্যবহার করা হতো, মহিলাদের বাজারে ক্রয় বিক্রয় চলতো।আরবের অর্থনীতি ছিল ব্যাবসা নির্ভর। পরিবহন, বাণিজ্যের জন্য তাদেরকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত করতে হতো, কিন্তু যাতায়াতের জন্য শুধু ছিল উটের ব্যবস্থা। পরিবহন ছিল অত্যন্ত সময়ের সাপেক্ষ ব্যাপার। পথ ছিল অত্যন্ত বিপদ সংকুল,পথেই ডাকাত দলের আক্রমনে লুটতরাজের শিকার হতো। নিষিদ্ধ মাসগুলোতে মোটামুটি শান্তি তে ব্যবসা করতে পারতো। আরব বাসিরা মদ, জুয়া, ব্যভিচার, নীতি নৈতীকতা হীন হলেও দয়া দাক্ষিণ্যে ছিল সবার শিখরে। উদারতার দিক দিয়ে তারা এতটাই অনুসরণীয় ছিলেন যে প্রচন্ড শীত কিংবা অভাবের সময় যদি কোন অতিথি আসতো আর তাদের ঘরে যদি একটি উট ছাড়া কোন কিছু না থাকতো, তবুও তারা সে উটটি জবাই করে দিত মেহমানদারীর খাতিরে। তারা দান করে ও যেমন গর্ব করত, মদ পান করে ও তেমন গর্ব করত। তারা যদি কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করতো তবে সেটা রাখার বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতো। তারা ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, রক্ষা কে ও সবকিছুর উপরে প্রাধান্য দিত। যদি সম্মান হানিকর কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হতো,

তবে সম্মান রক্ষা করার জন্য তারা তরবারি নিয়ে সংঘর্ষ লিপ্ত হয়ে যেত। ইসলাম পূর্বের আরব বাসীরা অত্যন্ত সরল, সহজ,অনাড়ম্বর জীবন যাপন করত। তাদের ভেতর ছিল না কোনো জটিলতা। বিশ্বাসঘাতকতা শব্দটির সাথে তাদের পরিচয় ই ছিল না। আমানতদারীতে তারা ছিল অনুসরণীয়।

আবরাহা একজন শাসক ছিলেন।তিনি ইয়ামানের দখলদারিত্ব নিয়ে সেখানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করে সবাইকে খৃষ্ট ধর্মে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছিল। তখনকার আরবের জনগণের নিকট কাবা ঘরের জন্য একটি আলাদা স্থান ছিল সেটা কাজে লাগিয়ে আবরাহর একটি গির্জা নির্মাণ করেন যেটা ছিল কাবা ঘরের অনুরূপ। সেই গীর্জার নাম ছিল আল-কালিস। আরব সম্প্রদায়ের লোকেদের যেটা একেবারে পছন্দ হয়নি। একদিন রাতের অন্ধকারে এক ব্যক্তি গিয়ে গির্জায় মলত্যাগ করে আসে এবং দেয়ালেও মল ছুড়ে আসে।এ ঘটনায় আবরাহার প্রচন্ড রেগে যায় এবং সে মক্কা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। সে তার বাহিনী নিয়ে আক্রমণের জন্য যাত্রা শুরু করে কিন্তু পথেই নুফাইল নামের একজন গোত্রের নেতা তাকে বাধা প্রদান করে।কিন্তু সে আবরাহার কাছে হেরে যায় এবং যুদ্ধবন্দী হয়। তাইফবাসীর সাথে কুরাইশদের শত্রুতার জেরে তাইফবাসী আবরাহাকে পথ দেখানোর জন্য রাজী হয়। কিন্তু সে পথের মধ্যে মারা যায়।আবরাহা আরবে পৌঁছে কিছু মেষ ও উট দখল করে নেয় যেগুলো ছিল নবীজি সাঃ এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব এর ।নুফাইল আব্দুল মুত্তালিবের বন্ধু ছিলেন। বন্দী অবস্থায় নুফাইলের সাথে উনাইস নামের এক ব্যক্তির বন্ধুত্ব হয়। উনাইস ছিল আবরাহার বাহিনীর হস্তিচালক। আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার সাথে দেখা করতে যায়। আব্দুল মুত্তালিব নুফাইলের সাথে দেখা করে তাকে জানায় যে সে আবরাহার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে। নুফাইলের মাধ্যমে উনাইস এর এ কথা শুনে সে আব্দুল মুত্তালিবের সাথে আবরাহার সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। জানা যায় আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ এবং অন্যরকম ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আবরাহার তাকে দেখে শ্রদ্ধার সাথে আমন্ত্রণ জানায়। আব্রাহার ছিলেন রাজা , তাই অন্য সবার সাথে সাক্ষাৎের সময় সে সিংহাসনে বসত, আর বাঁকিরা নিচে বসত। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব কে দেখে এতটাই শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় যে সে শুধু আব্দুল মুত্তালিবকে নিচে না বসিয়ে আব্দুল মুত্তালিবের সাথে নিজেও নীচে বসে পড়ল এবং জানতে চাইল আব্দুল মুত্তালিব কি চায়।আব্দুল মুত্তালিব ও কোনো ভনিতা না করে দোভাষীকে জানালো যে সে উট

ফেরত নিতে এসেছে।আবরাহার তখন রেগে বললো তোমার প্রতি সমস্ত সম্মান আমার এখানেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সে বলে কাবা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সে এখানে এসেছে,আর আব্দুল মুত্তালিব কিনা তার উট ফেরত নিতে এসেছে। তারপর আব্দুল মুত্তালিব বলে যে এই উটের মালিক আমি তাই তার কাছে ফেরত নিতে এসেছি। আর কাবা ঘরের মালিক স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাতায়ালা তাই তার রক্ষণাবেক্ষণ তিনি করবেন। একথা শুনে আবরাহা আব্দুল মুত্তালিবের উট ফিরিয়ে দেয়। ফিরে এসে আব্দুল মুত্তালিব পরিস্থিতির কথা সবাইকে জানিয়ে দেয় এবং মক্কা ছেড়ে সবাইকে পালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। সবাই মক্কা ছেড়ে পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয। সর্বশেষ মক্কা থেকে আব্দুল মুত্তালিব বিদায় নেন। আব্দুল মুত্তালিব যাওয়ার সময় কাবার চাদর জড়িয়ে কাঁদতে থাকে এবং আল্লাহর কাছে তার ঘর রক্ষা করার জন্য দোয়া করতে থাকে।

আবরাহা তার সৈন্য নিয়ে মক্কা আক্রমণ করতে আসার পথে কাবার অভিমুখে হাতিবাহীনিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিলেও হাতিবাহীনি অগ্রসর হচ্ছিল না।কিন্তু যখনই হাতিচালকেরা অন্য দিকে হাতিদেরকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছিল হাতিগুলো ঠিকই অগ্রসর হচ্ছিল। এটা ছিল রবের এক অনন্য নিদর্শন। তারা হাতিগুলো কে মারল, বল্লম দিয়ে রক্তাক্ত করলে ও হাতিগুলো অগ্রসর হচ্ছিল না।পরে তারা হাতিগুলো কে রেখেই নিজেরা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আল্লাহ সুবহানুওয়া তায়ালা তখন তাঁর সৈন্যবাহিনী হিসেবে একদল পাখি পাঠালেন। সবগুলো পাখি একটি করে পাথর নিয়ে আবরাহার বাহিনীর দিকে ছুঁড়লে, মূহুর্তেই আবরাহার বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেলো সুবহানআল্লাহ।কুরআনে যে ঘটনা সূরা ফিলে বর্ণিত আছে

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ

তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেননি?

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ

আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন।(সূরা ফিল আয়াত২,৩)

রাসুল সাঃ এর জন্মের বছরে এ ঘটনা ঘটেছিল তাই তাঁর জন্মের বছর কে হাতির বছর বলা হয়।

রাসূলুল্লাহর(সাঃ) জন্মের সময় তাঁর মা আমিনা একটি আলো দেখতে পান। তিনি দেখতে পান সে আলো তার শরীর থেকে বেরিয়ে পড়েছে এবং সেটা শাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এই আলোয় প্রমাণ করে যে এটা কোন স্বাভাবিক আলো না, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাবে এই আলো মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের মাধ্যমে। রাসূল(সাঃ) ৯ ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিন সুবহে সাদিকের সময় দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণে বিখ্যাত মক্কার বনু হাসিম বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে সাদ হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) এর মা আমিনা বলেছেন তাঁর জন্ম যখন হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর শরীর হতে একটি জ্যোতি বের হতে দেখেছিলেন, যার আলোতে শ্যাম দেশের অট্টালিকা সহ সবকিছু আলোকিত হয়েছিল।নবুওয়্যাতের চিহ্ন স্বরুপ অনেক ঘটনায় রাসুল (সাঃ) জন্মকে ঘিরে আছে বলে জানা যায়,তবে ইতিহাস থেকে সকল ঘটনার সত্যতা জানা যায় না। মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদদের পরিভাষায় সেগুলোকে ইরহাসাত বা অপেক্ষমান নিদর্শন ও বলা হয়ে থাকে। নবীজি (সাঃ) এর মাতা আমিনা থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ যখন তাঁর গর্ভে তখন তাঁকে সুসংবাদ দেয়া হয় যে,তোমার গর্ভে যে শিশু রয়েছে সে উম্মাহর নেতা হবে, শিশুটি ভুমিষ্ট হওয়ার পর তুমি এ দোয়া করবে যে তাকে আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করছি এবং তার নাম রাখবে মোহাম্মদ। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে তিনি এমন কোন মহিলাকে দেখেননি যারা গর্ভবতী হয়েও তার মত এতটা হালকা ও সহজবোধ করেছেন।এমনকি গর্ভধারণ সংক্রান্ত যে সমস্ত জটিলতা রয়েছে নবীজি (সাঃ) তাঁর গর্ভে থাকা অবস্থায় তিনি তেমন কিছুই দেখতে পাননি। রাসুল (সাঃ) ৯ ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিন সুবহে সাদিকের সময় দিন ও রাএের সন্ধিক্ষণে বিখ্যাত মক্কার বনু হাসিম বংশে জন্মগ্রহন করেন। কোন কোন ইতিহাসবিদগন লিখেছেন হস্তি বাহিনীর ঘটনা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল ঘটেছিল। এর মাধ্যমে জানা যায় ঈসা (আঃ) এর জন্মের ৫৭১ বছর পর নবীজির জন্ম হয়।ইবনু আসাকির" রাহ. পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, আদম ও নুহ আ.-এর মধ্যখানে ১ হাজার ২০০ বছরের ব্যবধান ছিল। নুহ আ. ও ইবরাহিম আ.-এর মধ্যখানে ছিল ১ হাজার ১৪২ বছরের ব্যবধান। ইবরাহিম থেকে মুসা আ. পর্যন্ত ৫৬৫ বছরের ব্যাবধান ছিল।। মুসা থেকে দাউদ আ. পর্যন্ত ৫৬৯ বছরের। দাউদ থেকে ইসা

আ. পর্যন্ত ১ হাজার ৩৫৬ বছর এবং ইসা আ. থেকে শেষ নবি মুহাম্মাদ ৬০০ বছরের ব্যবধান ছিল।

এ হিসাবে আদম থেকে আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাঃ পর্যন্ত ৫ হাজার ৩২ বছরের ব্যবধান ছিল। তা ছাড়া প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আদম আ.-এর বয়স হয়েছিল ৯৬০ বছর। তাই আদম আ.-এর পৃথিবীতে আগমনের প্রায় ৬ হাজার বছর পর অর্থাৎ, সপ্তম সহস্রাব্দে নবিজির জন্ম হয়। রাসুল সাঃ জন্মের সময় আরবের পরিস্থিতি ছিল বর্ণনাতীত,সে সময় তাদের নেত্রত্বের ও প্রয়োজন ছিল।

পিতার দিক থেকে নবীজির বংশধারা

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আবদি মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব ইবনু মুররা ইবনু কাআব ইবনু লুওয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফিহর ইবনু মালিক ইবনু নাজার ইবনু কিনানা ইবনু খুজায়মা ইবনু মুদরিকা ইবনু ইলয়াস ইবনু নিজার ইবনু মাআদ ইবনু আদনান।
এ পর্যন্ত নবিজির বংশধারা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত

মায়ের দিক থেকে নবীজির বংশধারা

মুহাম্মাদ ইবনু আমিনা বিনতু ওয়াহাব ইবনু আবদি মানাফ ইবনু জুহরা ইবনু কিলাব।

নবীজি সাঃ এর বংশধারা ছিল সবচেয়ে মর্যাদার ও সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত।চরম শত্রুতা থাকা সত্বেও মক্কার কাফেররাও এ সত্য অকপটে স্বীকার করতো। রাসুল সাঃ খারাপ মানুষদের মধ্যে ভালো মানুষ ছিলেন না বরংচ তাঁর বংশধারাকে আল্লাহ সুবহানুওয়া তায়ালা জাহেলিয়াতের যুগেও যখন যিনা ব্যাভিচার সহ সমস্ত খারাপ কাজ শীর্ষে অবস্থান করছিল, তখনো আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা তাঁর বংশধারা কে হেফাজত করেছেন। তাঁর পূর্ব পুরুষের কেউই জঘন্য কাজে লিপ্ত ছিল না, সবই ছিলেন বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে আবদ্ধ।
রাসুল সাঃ এর হাদিস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি বৈবাহিক সম্পর্ক জাত সন্তান। আদম থেকে শুরু করে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত আমার বংশধারায় কোন অবৈধ সন্তান নেই। জাহেলিয়াতের ব্যভিচার আমার বংশকে দূষিত করতে পারেনি।

রাসুল সাঃ এর নামসমূহ

কুরআনে রাসুল সাঃ এর দুটি নাম সরাসরি উল্লেখ আছে। মুহাম্মাদ চারবার ও আহমাদ একবার। সহীহ মুসলিম হতে বর্ণিত রাসূল সাঃ বলেছেন আমার পাঁচটি নাম রয়েছে, মোহাম্মদ, আহমাদ, আল মাহি, আল হাসির, আল আকিব।

মুহাম্মদ অর্থ সর্বাধিক পরিমাণে প্রশংসিত যাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করা হয়। ফেরেশতা, পূর্ববর্তী নবীগন এবং পৃথিবীর সকল মানুষ যার প্রশংসা করে তিনিই রাসুল সাঃ।তাঁর চেয়ে বেশি প্রশংসার হকদার আর কেউ নেই, এটিই তাঁর নামের তাৎপর্য। আহমাদ অর্থ সর্বোত্তম গুনে গুণান্বিত এবং এমন কোনো শব্দ ভান্ডার নেই যা দিয়ে রাসুল সাঃ এর প্রশংসা করে শেষ করা যাবে। তাঁর চেয়ে উত্তম প্রশংসা আর কারোরই হয় না। আল মাহি অর্থ হচ্ছে কোন কিছুকে মুছে ফেলা। রাসুল সাঃ আগমনের এর মাধ্যমে শিরক ও কুফর কে মুছে ফেলা হয়েছিল এজন্য তাঁর নাম আল মাহি। আল হাসির অর্থ হচ্ছে যার পেছনে একত্রিত করা হয়। কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম রাসূল সাঃ কে পুনরুজ্জীবিত করা হবে,এবং তাঁর পেছনে সমগ্র মানুষ উত্থিত হবে। আল আকিব অর্থ ধারাবাহিকতায় সবশেষে যিনি এসেছেন।রাসুল সাঃ নবী রাসূল প্রেরনের ধারাবিহকায় সবশেষে প্রেরিত হয়েছেন

আল্লাহ বলেন-

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

অর্থ, মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (সুরা আহযাব)

এজন্য তাঁর নাম আল আকিব।

নাবিয়্যুর রহমান অর্থাৎ রহমতের নবী। নবী সাঃ কে আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরুপ প্রেরন করেছিলেন। এজন্য তাঁর আরেকটি নাম নাবিয়্যুর রহমান। রাসুল সাঃ এর সবচেয়ে পরিচিত কুনিয়া অর্থাৎ উপনাম ছিল আবু কাসিম। তাঁর বড় পুত্র কাসেমের নামানুসারে তাঁর এ উপনাম করা হয়। তাঁর আরেকটি কুনিয়া

ছিল আবু ইব্রাহীম। কাসিম ও আবু ইব্রাহিম উভয়েই শিশু অবস্থতাতেই মারা যান। ইব্রাহিম ছিলেন তাঁর ক্রীতদাসী মারিয়া কিবতিয়ার সন্তান।

নবীজি সাঃ জন্মের পূর্বেই তিনি তাঁর মাথার উপর থেকে পিতার ছায়া হারিয়ে ফেলেন।নবীজি সাঃ এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব নবীজির পিতা আব্দুল্লাহকে মদিনা থেকে খেজুর আনার নির্দেশ দেন। আব্দুল্লাহ রাসুল সাঃ কে মাতৃগর্ভে রেখে মদীনায় যান।ঘটনাচক্রে সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।নবীজির আগমনের সুসংবাদ তাঁর মাতা আমিনা সর্বপ্রথম নবীজি সাঃ এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব কে পাঠান। খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে তিনি নবীজি সাঃ কে কোলে তুলে নিয়ে কাবা অভিমুখে রওনা হন এবং সর্বপ্রথম কাবা গৃহে প্রবেশ করে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন এবং তাঁর জন্য কল্যান প্রার্থনা করেন। এবং তাঁর নাম ঠিক করেন মুহাম্মাদ। মুহাম্মদ নামটা তখন আরবে খুব একটা প্রচলিত ছিল না এটা ছিল অভিনব একটা নাম। তারপর আরবের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাঁকে সপ্তম দিনে খতনা করা হয়। নবীজির জন্মের পর তাঁর মা আমিনা প্রথমে তাঁকে দুধ পান করান।আবু লাহাবের দাসী সুওয়ায়বা তাঁর মায়ের পর সর্বপ্রথম তাঁকে দুধপান করিয়েছিলেন। মাসরুহ নামের এক সন্তান তখন তাঁর কোলে ছিল। আরবের সম্ভ্রান্ত লোকেরা সে সময় তাদের বাচ্চার মানসিক বিকাশ, দেহকে সুঠাম, দৈহিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে, আরবি ভাষা সহজে রপ্ত করার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামে পাঠিয়ে দিতেন। এজন্য গ্রামের মহিলারা প্রায় সময়   শহরে আসতেন দুগ্ধপোষ্য শিশু নিতে। নবীজির দুধ মা হালিমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি তায়েফ থেকে সাদ গোত্রের মহিলাদের সঙ্গে দুগ্ধ পোষ্য শিশু নিতে শহরে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সে বছর দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল। তখন তার কোলেও দুগ্ধপায়ী সন্তান ছিল, তবে তারা খুব অভাবের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করার কারনে তার দুগ্ধপায়ী শিশু ও দুধ পান করতে পারছিলোনা। তাদের একটি উটনী ছিল সেটিও দুধ দহন করতে পারত না ফলে তারা খুবই ক্ষুধার যন্ত্রণায় দুঃখ দুর্দশায় দিন কাটাতো। এরপরেও তারা শিশু নিতে মনস্থির করে মক্কায় রওনা হন।কারন দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতাপিতার নিকট থেকে সবাই উত্তম বিনিময় আশা করতো। হালিমা রাঃ বলেন তাঁরা যে গাধার পিঠে আরোহন করে মক্কায় যাচ্ছিলেন সেটা ছিল অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির।
 কাফেলার অন্যান্য যাত্রীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না এজন্য অন্য সবাই বিরক্ত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু অনেক কষ্ট পাড়ি দিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত মক্কায় পৌঁছান।

সেখানে পৌঁছানোর পর কাফেলার মহিলারা জানতে পারে, যে শিশু মুহাম্মাদ সাঃ ইয়াতিম। এজন্য তারা তাঁকে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ এক্ষেত্রে কোন বিনিময় পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। কাফেলার সবাইকে প্রায় প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও কেউ শিশু মুহাম্মদ কে নিতে রাজি হয়নি। এদিকে হালিমা কোন শিশু না পেয়ে তাকে এভাবে ফিরে যেতে হবে ভেবে, তিনি তার স্বামীকে প্রস্তাব দিলেন এভাবে ফিরে যাওয়ার চেয়ে ইয়াতীম শিশুটিকে নিয়ে যায়। তাঁর স্বামী ও সম্মত হলেন এবং বললেন হয়তো আল্লাহ এর মধ্যে আমাদের জন্য কল্যান রেখেছেন। হালিমা বলেন এরপর আমাদের দল মক্কা থেকে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে সবাই রওনা হলেন, পথিমধ্যে আমরা একটি তাবুতে এসে আশ্রয় নিলাম বিশ্রামের জন্য এবং সেখানে দুধ পান করাতে গিয়ে আশ্চর্য হলাম একজনের পরিবর্তে দুজন শিশুই অধিক পেট পুরে দুধ পান শেষে শান্তিতে ঘুমিয়ে গেলো। মক্কা অভিমুখে যাত্রার সময় যে গাধাটি ছিল সবচেয়ে দুর্বল, সেটি ফিরতি পথে সবাইকে পেছনে ফেলে আমাদের কাফেলাতে এসে পৌঁছালো।যে উটের দুধ দহন করতে পারতাম না সেই উটের ওলান দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। দুগ্ধবতী বকরিগুলো থেকে দুধ দোহন করে আমরা তৃপ্তি সহকারে পান করলেও, অন্যান্যরা তাদের বকরিগুলো থেকে এক ফোটা দুধ ও পেত না। তাদের রাখালদের তারা নির্দেশ দিতেন আমাদের বকরীগুলো যেখানে চড়ায় তারা যেন তাদের বকরিগুলোকে সেখানে চড়ায়। মোদ্দকথা মুহাম্মাদ সাঃ নামক নক্ষত্রের এর আগমনের পর পুরো পৃথিবীর সাথে সাথে আমিনা ও হালিমার পরিবারেও সেই নক্ষত্রের আলোতে আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। এভাবে দেখতে দেখতে পুরোপুরি দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে হালিমা রাঃ দুগ্ধ পান বন্ধ করে দিলেন। হালিমা সাদিয়া রা. বলেন, 'আমি যখন নবিজিকে দুধ পান ছাড়াই, তখন তাঁর পবিত্র জবানে এ কথাগুলো উচ্চারিত হতো,

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও মহান। সব প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তাআলা সব ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে পবিত্র। ১৮

অন্য শিশুর তুলনায় এই শিশুটি এত দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকল যে দুই বছরে তার শরীর সুঠাম ও শক্ত হয়ে গেল। তার লালন পালনের মেয়াদ ২ বছর পূর্ণ হওয়ার পর,

আমরা তার মা আমেনার কাছে তাকে নিয়ে গেলাম, নিয়ে গিয়ে আমাদের সংসার জীবনের অনেক অসচ্ছলতার কথা জানালাম। তখনও দুর্ভিক্ষ চলছিল এজন্য আমরা তাঁর কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করলাম যে তিনি যেন আরো কিছুকাল আমাদের নিকট থাকে,তিনি আমাদের কে অনুমতি প্রদান করলেন।

নবীজির দৈহিক বর্ননা

হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের পুএ মুহাম্মাদের পুএ ইব্রাহিম থেকে গুফরার আজাদকৃত দাস উমার রাসুল সাঃ দৈহিক ও চারিএিক বৈশিষ্ট নিম্নরুপে বর্ননা করেছেন।আলী ইবনে আবু তালিব বলেন তিনি অধিক লম্বা ছিলেন না, আবার খুব বেঁটে ও ছিলেন না। তিনি উচ্চতায় মধ্যম আকৃতির ছিলেন।তাঁর চুল অত্যাধিক কুঞ্চিত ছিল না আবার একেবারে অকুঞ্চিত ও ছিল না।বরং তা কিঞ্চিত কোঁকড়ানো।তিনি বেশি স্থূল বা মোটা ছিলেন না। তাঁর মুখমন্ডল একেবারে গোলাকার ও ক্ষুূ্দ্র ছিল না।চোখ দুটো কালো ছিল।লম্বা ভ্রু-যুগল,গ্রন্হির হাড়গুলো ও দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী হাড়টি ছিল উঁচু ও সুস্পষ্ট। বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কালো। লম্বা ভ্র-যুগল, গ্রন্থির হাড়গুলো ও দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী হাড়টি ছিল উঁচু ও সুস্পষ্ট। হাত ও পায়ের পাতা ছিল পুষ্ট, চলার সময় পা দাবিয়ে দিতেন না, মনে হতো যেন কোন নিম্ন ভূমিতে নামছেন। কোনদিকে ফিরে তাকালে গোটা শরীর নিয়ে ফিরতেন। তাঁর দুই স্কন্ধের মাঝখানে নবুওয়াতের সীল বা মোহর লক্ষণীয় ছিল। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন শেষ নবী, শ্রেষ্ঠ দানশীল, শ্রেষ্ঠতম সাহসী, অতুলনীয় সত্যবাদী, সবচেয়ে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন, সবচেয়ে অমায়িক ও মিশুক। প্রথম নজরে তাঁকে দেখে সবাই ঘাবড়ে যেতো।" তাঁর প্রশংসাকারী আলী (রা) বলেন, "তাঁর মত মানুষ তাঁর আগেও দেখিনি পরেও দেখিনি।"

নবীজি সাঃ এর বক্ষবিদারন

নবী সাঃ এভাবে দুগ্ধ পান এর সময়সীমা অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরও বনু সাদ গোত্রে অবস্থান করতে লাগলেন। ইবনে ইসহাক এর বর্ণনা মতে সাদ গোত্রে অবস্থানকালে কয়েক মাস পরে বর্ণনামতে সেটা ছিল তাঁর জন্মের ৪র্থ কিংবা ৫ম বছরে তার বক্ষ বিদারণের ঘটনা ঘটে। সহিহ মুসলিমে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। একদিন বালক নবী সাঃ তাঁর সাথীদের সাথে একসাথে খেলা করছিলেন। এমন সময় জিব্রাইল আঃ সেখানে এসে উপস্থিত হন। তারপর তাঁকে নিয়ে গিয়ে একটু দূরে সরিয়ে দেন এবং চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর হৃৎপিন্ডটি বের করে আনেন। তারপর তার থেকে জমাট রক্ত বের করে নিয়ে বললেন এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ যা তোমার মধ্যে ছিল। তারপর হৃদপিণ্ডটি একটি সোনার তস্তুরিতে রেখে জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করে আবার পূর্বের স্থানে জোড়া লাগিয়ে দেন। এ সময় তার সঙ্গী সাথীরা হালিমার কাছে গিয়ে খবর দিলেন মুহাম্মাদ সাঃ মারা গেছেন। বিবি হালিমা একথা শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন নবী সাঃ এর মুখ মলিন হয়ে আছে, তারা বাড়িতে নিয়ে এসে তাঁকে সেবা যত্ন করেন। আনাস রাঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন আমি রাসুল সাঃ এর বক্ষে সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি। নবী সাঃ এর বক্ষ বিদারণের ঘটনায় হালিমা রাঃ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তিনি তাঁর মাতা আমেনার কাছে নবী সাঃ কে ফেরত দেন। রাসুল সাঃ ৬ বছর পর্যন্ত হালিমার ঘরে বড় হন, দুধ মার ঘর থেকে নবী সাঃ কে পেয়ে আমেনা স্বামীর কবর জিয়ারত করতে চান, তারপর শশুরের ব্যবস্থাপনায় শিশু পুত্র মুহাম্মদ কে নিয়ে মক্কা মদিনার মধ্যবর্তী ৫ ০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মদিনায় পৌঁছান। সেখানে এক মাস থাকার পর মক্কা ফেরার উদ্দেশ্যে মদিনা যাত্রা করলে যাএাপথে অসুস্থ হয়ে পড়েন।ক্রমান্বয়ে অসুস্থতা বাড়তে থাকলে তিনি ইন্তেকাল করেন। পিতৃ মাতৃহীন নবী সাঃ অসহায় হয়ে পড়েন। মহান আল্লাহ দেখাতে চেয়েছেন এ বালক তাঁর রহমতে, তাঁর জিম্মাদারীতেই লালিত পালিত হবেন। তারপরে তিনি তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের সাহচার্জে দিন যাপন করতে লাগলেন। আব্দুল মুত্তালিব এর জন্য কাবা ঘরের ছায়াতে একটি বিশেষ আসন থাকতো। তাঁর সন্তানেরা কেউই সে আসনে তাঁর সম্মানার্থে বসতো না। কিন্তু নবী সাঃ সে আসনে বসতেন। এ অবস্থা দেখে তাঁর চাচারা তাঁকে সেখান থেকে নামিয়ে নিতে চেষ্টা চালালে আব্দুল মুত্তালিব বলেন, তোমরা এমনটি

করোনা। কারন এটি একটি বিশেষ শিশু, তোমরা একে সাধারণ মনে করো না। এ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তারপর তাঁকে নিজের কাছে বসিয়ে রাখতেন এবং তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। তাঁর কথা, কাজকর্ম সবকিছু দেখে খুশি হতেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব । নবী সাঃ এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর যখন বয়স আট বছর দুই মাস দশ দিন তখন মৃত্যুবরণ করেন। তখন নবীজি সাঃ এর চাচা তখন তাঁর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। আব্দুল মুত্তালিব অবশ্য আবু তালিব কে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন। আব্দুল মুত্তালিবের ওসিহত আবু তালিব খুব ভালোভাবে পালন করতে থাকেন। আপন সন্তানের মত ভালবাসতেনই না বরংচ বলতে গেলে নিজের সন্তানদের চেয়ে অধিক স্নেহ করতেন রাসুল সাঃ কে। রাসুল সাঃ এর ৪০ বছর পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তাঁকে লালন পালন করেছেন। লোকজনের সঙ্গে তিনি বাক-বিতন্ডাতে পর্যন্ত জড়িয়েছেন। কথিত সূত্রে আছে নবী সাঃ এর বয়স যখন ১২ বছর, তখন তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম ভ্রমণ করেন । তাঁরা সফরের একপর্যায়ে গিয়ে বসরায় উপস্থিত হন। শাম রাজ্যের এবং হুরারের কেন্দ্রীয় শহর ছিল বসরা। এ শহরে একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক বাস করতেন যার নাম ছিল জার্জিস। তাঁর উপাধি ছিল বাহিরা। তিনি মক্কার ব্যবসায়ী দল বসরায় শিবির স্থাপন করলে, রাহিব গীর্জা থেকে বেরিয়ে তাদের নিকট আগমন করেন। অথচ ইতিপূর্বে তিনি কখনো এমন কাজ করেননি। তিনি কিশোর নবী সাঃ এর আচার আচরণ বৈশিষ্ট্য দেখে কিছুটা অনুমান করেন যে তিনি হচ্ছে বিশ্ব জাহানের নবী। কুরাইশের লোকজন যখন জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি কিভাবে বুঝেছেন, তখন তিনি বললেন গিরিপথের ওই প্রান্ত থেকে তোমাদের আগমন যখন ধীরে ধীরে দৃষ্টিগোচর হয়ে আসছিল, তখন আমি প্রত্যক্ষ করলাম সেখানে এমন কোন বৃক্ষ বা প্রস্তর খন্ড ছিল না যা তাঁকে সিজদাহ করেনি। এ সকল জিনিস নবী রাসুল ছাড়া কাউকে সিজদা করে না। মোহরে নবুয়্যাত দেখে তিনি সে সম্পর্কে বলেন যে আমাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে থেকে অবগত হতে পেরেছি। তারপর তিনি তাঁদেরকে আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেন। একই সঙ্গে আবু তালেবকে বলেন একে সঙ্গে নিয়ে শাম ভ্রমণ করবেন না। শীঘ্রই দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এর পরিচয় অবগত হলে ইহুদী ও রুমিগণি তাঁকে হত্যা করে ফেলতে পারে। এ কথা জানার পর আবু তালিব তাঁকে কয়জন গোলামের সাথে মক্কা ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন।

বকরি চরানো,সকল নবীর পেশা

নবী সাঃ একদিন দুধমাতা হালিমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার আরেকজন ভাই কোথায়? তাকে দেখতে পায়না? জবাবে হালিমা বলেন সে মাঠে বকরি চরাতে যায়। এ কথা শুনে রাসুল সাঃ বললেন আমি ও কাল থেকে তার সাথে বকরি চরাতে যাব। নবী সাঃ এর প্রথম পেশা ছিল বকরি চরানো। মূলত সকল নবীগনের ই বকরি চরানো পেশা ছিল। রাসুল সাঃ বলেন আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি মেষ পালন করতেন না। তখন তাঁর সাথীরা জিজ্ঞাসা করতেন আর আপনি? তখন রাসুল সাঃ বলেন আমি ও বকরি চরাতাম ও মক্কার লোকদের কাছ থেকে এর বিনিময় নিতাম। আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা এ কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সকল নবী রাসুল কে।মেষ পালন থেকে আমরা অনেকগুলো শিক্ষা পাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা টা পায়, রাসূল সাঃ বলেন তোমরা সকলেই হলে মেষপালক। তোমরা তোমাদের পালের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবে। উদাহরণস্বরূপ মুসলিমদের জন্য দায়িত্বশীল হলেন তাদের ইমাম, পরিবারের জন্য পরিবারের কর্তা, নেতার দায়িত্ববোধ দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ সকল নবী কে উম্মাহর নেতা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এ থেকে আরো শিক্ষা পাওয়া যায় , বকরিদের মধ্যে যেমন নিজেদের মধ্যে মারামারি লাগে, কখনো পশুদের সাথে খেলা করে, কিন্তু যিনি মেষপালক তাকে ধৈর্য্য ধরে সবকিছু খেয়াল রাখতে হয়। আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা এখানে তাঁদেরকে ধৈর্য্যের শিক্ষা দিয়েছেন। মুসা আলাইহি ওয়া সালামের কওম তাঁর সাথে যা করেছিল তা ছিল রীতিমত অসহনীয়। এ পরিস্থিতি সামালে নেয়ার জন্য তাঁকে দিয়ে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি সময় ১০ বছর ধরে মেষ পালনের কাজে ব্যায় করান। নুহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৯৫০ বছর দাওয়াহর কাজ করান।এরপরও তিনি ধৈর্য্য হারাননি।

তিনি বলেন আমি চেষ্টা করেছি প্রকাশ্যে এবং গোপনে, আমি চেষ্টা করেছি দিনে ও রাতে আমি চেষ্টা করেছি প্রত্যেক উপায়ে। সুরক্ষা প্রদান ও ছিল এর একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ভেড়ার পালে নেকড়ে বা অন্যান্য প্রাণীরা হামলা চালাতে পারে, রোগব্যাধি থাকতে পারে কিন্তু মেষপালক তাদের এটা নিশ্চিত করে যে তারা আশঙ্কামুক্ত।নবী রাসুল রা ও এর অনুরূপ ছিলেন তাঁরা উম্মাহকে সর্বদা শারীরিক মানসিক সব ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন।মানুষ যে পরিবেশে থাকে সেখানেই

মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে।মেষপালক দের জীবন ছিল সহজ, সরল। নবী রাসুল গন ও অনেক সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন।

হিলফুল ফুযুল

নবী সাঃ এর প্রাথমিক জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে হিলফুল ফুযুল অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিলফুল ফুযুল প্রতিষ্ঠার পেছনে একটি ঘটনা জানা যায়। কিছু মালপত্র নিয়ে ইয়ামেনের জুবাইদ নামক একজন ব্যক্তি মক্কায় আসেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে। তার নিকট থেকে মালপত্র ক্রয় করেন আস বিন ওয়ায়িল সাহমী। ক্রয়কৃত জিনিসের বিনিময় মূল্য তাকে না দিয়ে তিনি তা আটকে রাখেন। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্যর জন্য তিনি আব্দুদ্দার,মাখযূম,জুমাহ,সাহম এবং এ সকল গোত্রের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান।ইয়েমেনি সেই ব্যাক্তি হক আদায় না করে নড়তে অনঢ়। সে মক্কায় ভিড়ের মধ্যে গিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে লাগলেন হে মক্কাবাসী আমি তোমাদের দেশে এসে জুলুমের শিকার হয়েছি তোমরা কে আছো যে আমার পাশে দাঁড়াবে, তোমরা কি তোমাদের দেশে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেবে। তার কথা শুনে কুরাইশের কিছু গোত্র একত্রিত হয়ে একটি চুক্তি করল দূর্বল ও নিপীড়িত মানুষরা যেন যেন কেউ নীপিড়িত বঞ্চিত না হয় এই শর্তে। চুক্তিতে অংশ নেয়া পরিবার গুলির মধ্যে নবীজি সাঃ এর পরিবার ও ছিল। নবীজি সাঃ তখন কিশোর কিন্তু চাচার সাথে সমস্ত সভায় যেতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জাদানের বাড়িতে সে সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার প্রকৃতির এবং অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সোচ্চার। তাঁর প্রতি সম্মানার্থে তাঁর বাড়িতে সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হলো যে সবাই মিলে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে। যদিও চুক্তি ছিল কাফেরদের মধ্যে। রাসূল সাঃ বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাদানের বাড়িতে যে চুক্তি হলো আমার যদি একপাল ভালো পশুর বিনিময়ে হলেও সে চুক্তিতে থাকার সুযোগ থাকতো তবে সে সুযোগ হাতছাড়া করতাম না। ইসলামের পর এমন ঘটনা ঘটলেও স্বাগত জানাতাম।অর্থাৎ ইসলাম আসার পরে চুক্তিতে থাকার সুযোগ হলে তিনি সানন্দে থাকতেন, কাফেরদের হলেও। এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা আছে। তা হলো মুসলিমরা সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে সেটা হোক মুসলিমের বিপক্ষে কিংবা পক্ষে।

রাসুল সাঃ মারা যাওয়ার পর আবারও হিলফুল ফুযুলের নামটি চলে আসে। ঘটনাটি ঘটেছিল হুসাইন ইবন আলী ইবনে আবু তালিব এবং আল ওয়ালিদ ইবনে উকবা ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে। মদিনার গভর্নর ছিলেন ওয়ালিদ। সে তার ক্ষমতার জোরে হুসাইনের সম্পত্তি দখল করে নেয়। হোসাইন ওয়ালিদের কাছে গিয়ে বলে তুমি হয় আমার প্রাপ্য আমাকে বুঝিয়ে দাও, নয়তো মসজিদে গিয়ে আমি হিলফুল ফুযুলের

ঘোষণা দেব।লোকদেরকে আমি হিলফুল ফুযুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিব। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের সে সময় ওয়ালিদের সাথে ছিলেন। হুসাইনের মুখে এ কথা শুনে তিনিও বললেন তবে আল্লাহর শপথ যদি হুসাইন হিলফুল ফুযুলের ডাক দেয় আমি আমার তরবারি উন্মুক্ত করবো এবং তার পক্ষ নেব, যতক্ষণ সে ন্যায় বিচার পাচ্ছে না আমরা যুদ্ধ করতে থাকবো। এ কথা অন্য মানুষের কানে গেলে তারাও একই রকম বলল। পরিস্থিতিতে সুবিধার নয় দেখে সে তাকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিল। এ থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মুসলমানেরা কারো প্রতি জুলুম সহ্য করে না সেটা নেতার অধীনেই হোক না কেন।আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা ও একে অপরকে ভালো কাজে সহযোগিতা করাকে একে অপরের উপর কর্তব্য বলেছেন।

আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা বলেন
ভালো কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সহযোগিতা করোনা। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাজ কঠিন শাস্তিদাতা
(সূরা মায়েদা)

খাদিজা রাঃ এর সঙ্গে বিবাহ

তৎকালিন আরবের ধণাঢ্য এক নারী ছিলেন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ।তিনি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী ও ছিলেন। তাঁর দাস মাইসারার কথাবার্তা থেকে মুহাম্মাদের মিষ্টি হাসি, সৎ চরিত্র, চিন্তাভাবনা, আমানতদারিতার কথা রাসূলুল্লাহ সাঃ এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আরো বাড়িয়ে দেয় এবং তাঁকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার একটা গোপন ইচ্ছা মনের মধ্যে ডানা বাঁধতে থাকে। সিরিয়া থেকে যুবক রাসুল সাঃ ব্যাবসা শেষে ফিরে এসে তার খতিয়ান প্রকাশ করলে, হিসাব নিকাশে আমানতে এত বেশি পরিমাণে অর্থ পাওয়া যায় এর পূর্বে তিনি তা কখনোই পাননি। বড় নেতা,গোত্রের সর্দার অনেকেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে খাদিজা রাঃ তা কবুল করেননি। তিনি তাঁর বান্ধবী নাফিসা বিনতে মুনাব্বিহ এর নিকট তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করলেন এবং মুহাম্মদের নিকট আলোচনা করার জন্য তাকে অনুরোধ করলেন। নাফিসা নবী কারিমের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। রাসুল সাঃ আবু তালিবের সাথে আলোচনা করলেন। আবু তালিব খাদিজার পিতৃব্যের সাথে আলোচনার পর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন এবং তাঁরা পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি খাদিজা রাঃ কে ২০ টি উট সেই সময় মোহরানা হিসেবে প্রদান করেন। সেই সময় খাদিজার বয়স ছিল ৪০ এবং রাসুল সাঃ এর ছিল ২১ বছর। নবীজির বিয়ের অনুষ্ঠানে বনু হাশিম ও বনু মুজারের নেতৃস্থানীয় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।আবু তালিব বিয়ের খুতবা পাঠ করেন।আবু তালিব বিয়ের খুতবায় নবীজি সাঃ সম্পর্কে বলেন

“”এ হচ্ছে আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ।সহায় সম্পদ কম থাকলেও সে উন্নত চরিত্রের।ফলে সমাজের আর দশজনের তুলনায় সে এতটাই উপরে অবস্হান করছে যে, যদি কাউকে তাঁর বিপরীতে দাঁড় করানো হয় সে তার থেকে অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে প্রমানিত হবে।কেননা অর্থ সম্পদ হচ্ছে ছায়ার মত পরিবর্তনশীল বস্তু।আর এই মুহাম্মদ যাঁর বংশ মর্যাদা ও আত্মীয়তা সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন সে খুওয়াইলিদের মেয়ে কে বিবাহ করতে যাচ্ছে। তাঁর বিয়ের মোহর থেকে নগদ যা দেবে এবং যা পরে পরিশোধ যোগ্য এর সব আমি প্রদান করব। আল্লাহর কসম ভবিষ্যতে সে বিপুল সম্মান ও মর্যাদার মালিক হবে।,,

অনন্য খাদিজা রাঃ

খাদিজা রাঃ বেঁচে থাকা অবস্থায় তিনি আর কোন বিবাহ করেননি।দীর্ঘ ২৪ বছর তাঁর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন।এর মধ্যে কিছু সময় ওহী নাজিলের আগে আর কিছু সময় ছিল ওহী নাজিলের পরে। সন্তানদের মধ্যে ইব্রাহিম ছাড়া সকলে খাদিজার সন্তান ছিল।নবীর প্রথম সন্তান আবুল কাশেম ছিল তাই তাঁর উপনাম হয় আবু কাশেম।মেয়ে চারজন ছিলেন রুকাইয়া,জায়নাব,ফাতিমা ,উম্মে কুলসুম।মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে তাঁর তৃতীয় সন্তান ইব্রাহিম জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর সকল পুত্রসন্তান বাল্য অবস্থায় ই মৃত্যুবরণ করেন। কন্যাদের মধ্যে সকলে ইসলামের যুগ পেয়েছেন ইসলাম গ্রহণ করেছেন সবাই তার জীবন দশায় ই মৃত্যুবরণ করে। ফাতিমা রাঃ তাঁর ইন্তেকালের ছয় মাস পর ইন্তেকাল করেন।রাসুল সাঃ খাদিজা রাঃ কে অসম্ভব ভালোবাসতেন। নবী সাঃ এর অন্যান্য স্ত্রীগণ উনার ইন্তেকালের পরে ও তাঁকে ঈর্ষা করতেন।তাঁর প্রতি ভালোবাসা, সম্মান,মমতা সবচেয়ে বেশি ছিল রাসুল সাঃ এর।তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর স্বরন থেকে রাসুল সাঃ কে থামানো যেতোনা।যখন রাসুল সাঃ সবার দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন তখন খাদিজা রাঃ তাঁকে আগলে রেখেছেন। আয়েশা রাঃ ছিলেন খাদিজা রাঃ এর পরে রাসুল সাঃ সবচেয়ে প্রিয় বিবি।বুখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে আয়েশা রাঃ বলেন আমি খাদিজা রাঃ কে ছাড়া নবীজি সাঃ এর আর কোন স্ত্রীকে ঈর্ষা অনুভব করিনি। এটা এজন্য নয় যে আমি তাকে কোনদিন দেখিনি বরং এটা এজন্য যে নবীজি সাঃ তাঁকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন। নবীজি সাঃ মাঝে মাঝে ভেড়ার মাংস খাদিজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দিতেন। খাদিজা মারা যাওয়ার পর ও তাঁর বান্ধবীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন।তিনি এগুলো করেছেন খাদিজা রাঃ এর প্রতি তাঁর অসম্ভব ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ থেকে। তিরমিজির একটি হাদিস থেকে বর্ণিত আছে আয়েশা রাঃ বলেন এমন অনেক দিন হয়েছে খাদিজার প্রশংসা না করে নবীজি ঘর থেকে বের হননি। একদিন এভাবে তিনি খাদিজার প্রশংসা করছিলেন আমি আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলাম তিনি কি এমন ছিলেন, তিনি তো একজন বয়স্ক মহিলা ছিলেন মাত্র। আল্লাহ সুবহানুওয়াতয়ালা কি তাঁর চেয়ে উত্তম নারীদেরকে দ্বারা আপনার স্ত্রীর স্থান পূরণ করে দেন নি। একথা শুনে নবীজি সাঃ রেগে যান।
“”’’রেগে গিয়ে বলেন আল্লাহর শপথ তিনি খাদিজার চাইতে উত্তম কাউকে আর আমার জীবনে আনেননি। যখন সবাই আমাকে অস্বীকার করেছে তখন সে আমার উপর আস্থা

রেখেছে। যখন সবাই আমাকে মিথ্যুক বলেছে তখন সে আমাকে বিশ্বাস করেছে। যখন সবাই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন সে তার সবকিছু দিয়ে আমাকে শান্তি দিয়েছে। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে আমার উপর রহমত দিয়েছেন। আমাকে তাঁর থেকে সন্তান দান করেছেন।"""

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা তাঁকে জিব্রাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে সালাম পাঠিয়েছেন। খাদিজা ছিলেন জান্নাতি রমণী আর জিব্রাইল আঃ নিজের পক্ষ থেকেও খাদিজা রাঃ কে সালাম দিয়েছেন। জিব্রাইল আঃ বলেন খাদিজাকে জান্নাতে বাড়ির সুসংবাদ দিন। এছাড়া বলেন দুনিয়ার মাঝে শ্রেষ্ঠ চারজন নারী মারিয়াম বিনতে ইমরান, খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ এবং আসিয়া ইবনে মুজাহিদ এই চারজনের মাঝে সেরা হলেন মারিয়াম।

আল্লাহ বলেন

"আর স্মরণ করো যখন ফেরেশতারা বলল হে মারাইয়াম নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও পবিত্র করেছেন আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের ঊর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। ""

তৃতীয় স্থানে আছেন খাদিজা রাঃ, তারপর ফাতিমা এবং চার নম্বরে আছিয়া বিনতে মুজাহিম। এদের মাঝে দুজন ছিলেন নবীদের মা খাদিজা ছিলেন নবীর স্ত্রী এবং ফাতেমা নবীর কন্যা।খাদিজা রাঃ মারা যাওয়ার পর নবিজি সাঃ দুই তিন বছর একাই জীবনযাপন করেন।

কাবা পুনর্নির্মান

ইসমাইল আঃ এর আমলে কাবার উচ্চতা ছিল নয় ফিট। কাবা ঘরে চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, কিন্তু কোন ছাদ ছিল না। এ কারণে অনেক সময় চোর এর মধ্যে প্রবেশ করে অনেক মূল্যবান সম্পদ চুরি করে নিয়ে যেত। রাসূলে সাঃ এর বয়স যখন ২৫ বছর তখন কাবা নির্মাণের কাজ শুরু করেন। অনেক পূর্বে নির্মিত হওয়ায় এর দেয়াল গুলো তে ফাটল দেখা যাচ্ছিল। ঐ বছর মক্কা প্লাবিত হয়ে যাওয়ার কারণে কাবাতে পানি প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এ কারণে দেয়ালের চরম অবনতি ঘটে এবং ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন কুরাইশরা মিলিত হয়ে কাবাঘর পুনরায় নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নেন। এবং কিছু নিয়ম নির্ধারণ করেন তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিল, এ ঘর নির্মানে ব্যায়কৃত অর্থ সম্পূর্ণ হালাল হতে হবে। সুদের অর্থ, হক নষ্ট করা অর্থ ছাড়া ও অন্যান্য খারাপ কাজের মাধ্যমে আয়কৃত অর্থ এখানে ব্যবহার করা যাবে না। সবাই এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। নতুন করে তৈরি করার জন্য পুরাতন দেয়াল ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সবাই ভয় পাচ্ছিল আল্লাহর ঘর ভাঙ্গার কাজে প্রথম হাত দিতে। ওয়ালিদ বিন মুগীরা সর্বপ্রথম ভাঙার কাজে হাত দিলেন এবং কোদাল হাতে নিয়ে বললেন

"হে আল্লাহ আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই তারপর দু রুকনের কিছু অংশ ভেঙে ফেলার পরও যখন কোন বিপদ আপদ এলো না, তখন দ্বিতীয় দিন থেকে সবাই ভাঙ্গার কাজে অংশগ্রহণ করেন। “”

ইব্রাহিম আঃ এর ভিত্তি পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হলে নতুন করে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বাকুম নামে একজন রুমীয় মিস্ত্রি দ্বারা এ কাজ এগিয়ে চলতে থাকে। হাজরে আসওয়াদ তথা কৃষ্ণ প্রস্তরটি স্থাপন নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবার মাঝে বিপত্তি বাঁধা দেয়। ঝগড়াঝাঁটি, কথা কাটাকাটি এমনকি অস্ত্রের মহড়া চলে। সবাই এই মহান কাজ সম্পন্ন করতে চায়। পরবর্তীতে বর্ষিয়ান নেতা আবু উমাইয়া মাখতুমি এই সমস্যার সমাধানের একটি প্রস্তাব করলেন যে, আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন তাঁর উপরে এ বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। আল্লাহর অপার মহিমায় দেখা দেখা গেল, সকালে সবার প্রিয় রাসূল সাঃ মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন । তাঁকে আসতে দেখে সবাই চিৎকার করে বলেন

“”আমাদের বিশ্বাসি আমরা সকলেই এর উপর সন্তুষ্ট তিনি মুহাম্মদ। “”

তারপর নবী সাঃ যখন সেখানে গেলেন তখন সবাই বিষয়টি পেশ করলে তিনি একখানা চাদর চাইলেন। তাঁকে চাদর দেয়া হলে তিনি তা মেঝেতে বিছিয়ে দিয়ে নিজের হাতে কৃষ্ণপ্রস্তর টি স্থাপন করলেন। তারপর বিবাদমান গোত্রপতিদের কে আহ্বান জানিয়ে বললেন আপনারা সকলে চাদরের পার্শ্ব ধরে উত্তোলন করুন, তারপর চাদর যখন হাজরে আসওয়াদ রাখার স্থানে পৌঁছাল তখন নিজের হাতে কৃষ্ণ প্রস্তরটি উঠিয়ে যথাযথ স্থানে রেখে দিলেন সবাই এটি মেনে নিল এবং সমস্যাটি সমাধান হয়ে গেল। কুরাইশদের বৈধ অর্থের ঘাটতি দেখা গেলে কুরাইশরা কাবা ঘরের দৈর্ঘ্য তখন ছয় হাত পর্যন্ত কমিয়ে দেয় । এ অংশটুকুই হিজর ও হাতীম নামে প্রসিদ্ধ। আদম আঃ নয়তো ইব্রাহিম আঃ প্রথমে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহর স্মরণের জন্য এটি নির্মিত প্রথম ঘর। আল্লাহ সূরা আল ইমরানে বলেন

নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেটাই হচ্ছে এ ঘর যা মক্কায় অবস্থিত বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক।

(সূরা আল ইমরান)

নবীজির কন্যাগন

১/ফাতিমা

এ বিষয়ে সবাই একমত ছিলেন যে নবী কন্যা গনের মধ্যে ফাতেমা ছিলেন সবচেয়ে বেশি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। দ্বিতীয় হিজরীর জিলহজ মাসে আলী রাঃ এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিয়েতে মোহর ধার্য করা হয় ৪৮০ দিরহাম বা প্রায় ১৫ ভরি ওজনের রূপা। বিয়ের সময় নবীজি সাঃ তাঁর সঙ্গে যেসব জিনিসপএ দিয়েছিলেন সেগুলো হচ্ছে একটি চাদর, খেজুরের ছাল ভর্তি একটি বালিশ, চামড়ার একটি গদি, দড়ির একটি খাট, চামড়া নির্মিত একটি পানির পাত্র, আটা পেসার একটি চাক্কি। ফাতিমা রাঃ ঘরের কাজকর্ম সবকিছু নিজের হাতে করতেন। নবীজির পুত্র সন্তানের কেউই জীবিত ছিলেন না ফলে কন্যা সন্তানের মাধ্যমে নবীজি সাঃ এর বংশধারা বিস্তৃত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শুধু ফাতিমার সন্তানরা দীর্ঘজীবন লাভ করেন অন্য কারোর সন্তানি হয়নি বা বেঁচে থাকেননি। ফাতেমার গর্ভে তিনজন ছেলে ও দুজন মেয়ে জন্ম নেন হাসান হুসাইন ও মুহসিন।মুহসিম ছোটো থাকতেই মারা যান ফলে হাসান হুসাইন এর মাধ্যমেই নবীজির বংশের বিস্তার হয়েছে। মেয়ে দুজন ছিলেন উম্মে কুলসুম ও জায়নাব। রাসূল সাঃ ফাতিমা রাঃ কে এত বেশি পরিমাণে ভালোবাসতেন যে
একবার তিনি বলেছিলেন ফাতিমা আমারি অংশ কেউ যদি তাকে কষ্ট দেয় সে আমাকেও কষ্ট দেয় কেউ যদি তাকে আনন্দ দেয় তাতে আমিও আনন্দিত হই।

২/জায়নাব

নবীজির বয়স যখন ৩০ বছর তখন যায়নাব রাঃ জন্মগ্রহণ করেন। আবুল আসের সঙ্গে নবীজি সাঃ তাঁকে বিয়ে দেন। এক ছেলে আলী এবং উমামা নামের এক মেয়ে তাঁর গর্ভে জন্ম নেয়। আলী অল্প বয়সে মারা যান।ফাতেমা রাঃ এর ইন্তেকালের পর আলী রাঃ উমামাকে বিয়ে করেন। তবে উমামার গর্ভে কোনো সন্তান জন্ম নেন নি। জায়নাব রাঃ অষ্টম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩/রুকাইয়া

নবীজি সাঃ এর বয়স যখন ৩৩ বছর তখন রুকাইয়া রাঃ জন্মগ্রহণ করেন।উসমান রাঃএর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। উসমান রাঃ যখন হাবশায় হিজরত করেন সেখানে তখন তাঁর সঙ্গে রুকাইয়া রাঃ ও ছিলেন।বদরের যুদ্ধ শেষে নবীজি যখন মদীমায় ফিরছিলেন তখন তিনি ইন্তেকাল করেন।তিনি দুবার হিজরত করেছেন, প্রথমে হাবশায়, এরপর মদিনায়।তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

৪/উম্মু কুলসুম

তিনি উম্মু কুলসুম নামেই পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায়নি। রুকাইয়া মারা যাওয়ার পর তৃতীয় হিজরিতে উসমান রঃ এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এজন্য উসমানের উপাধি ছিল জুননুরাইন বা দুই নুরের অধিকারী।।তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় নবম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। নবীজি বলেন

“”আমার যদি আর কোনো মেয়ে থাকত, তবে তাকে ও আমি উসমানের সঙ্গে বিয়ে দিতাম।””

রুকাইয়া একবার উসমান রাঃ এর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পিতার কাছে অভিযোগ জানালে রাসুল সাঃ বলেন,নারীরা তাদের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে,এটা আমি পছন্দ করিনা।তুমি ঘরে ফিরে যাও।

নবীজির অন্যান্য স্ত্রীগণ

সাওদা বিনতু জামআ

রাসুল সাঃ খাদিজা রাঃ এর মৃত্যুর পর সাওদা বিনতু জামআকে বিবাহ করেন। তাঁর পূর্বের স্বামী সাকরান ইবনু আমরের বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।উভয়েই প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহন করেন এবং হাবশায় দ্বীতিয় হিজরত করেন।হাবশায় মুহাজির দের সাথে মক্কায় ফিরলে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয় এবং নবীজি সাঃ তাঁকে বিবাহ করেন।উমার রাঃ এর খেলাফতের শেষের দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩/ আয়েশা সিদ্দিকা

আয়েশা রাঃ শাওয়াল মাসে নবুয়তের ৫ম বছরে জন্ম নেন।নবুয়তের দশম বছরে নবীজির সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর।আয়েশা রাঃ ছিলেন নবীজির একমাএ কুমারি বিবি।আয়েশা রাঃ এর যখন ১৮ বছর তখন নবী সাঃ মৃত্যু বরন করেন। মাত্র ৯ বছরের নবী সাহাচর্যে ছিলেন তিনি। আর কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা সাহাবীদের বিভিন্ন বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। তিনি ছিলেন উম্মতের সবচেয়ে বড় ফকিহ নারী এবং নারীদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। বড় বড় সাহাবীরা ও তাঁর থেকে ফতোয়া নিতেন। তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন সর্বমোট ২২১০ টি। সাহাবীরা বলতেন কোন মাসআলায় সমস্যা পেলে আয়েশা রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলে আমরা সমাধান পেয়ে যেতাম। ৬৭ বছর বয়সে ৫৮ হিজরীর ১৭ই রমজান তিনি ইন্তেকাল করেন।

হাফসা বিনতু উমর

জায়নাব বিনতু মাজউন ও উমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ এর মেয়ে ছিলেন হাফসা বিনতু ওমর। নবুয়তের পাঁচ বছর আগে তিনি জন্ম নেন। প্রথমে তাঁর বিবাহ হয় ইবনু হুজাফা সাহমি এর সঙ্গে। তৃতীয় হিজরীতে নবীজি তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর থেকে ৬০ টি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি মদিনায় ৪৫ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

জায়নাব বিনতু খুজায়মা হিলালিয়া

তাঁর প্রথমে বিয়ে হয় তুফায়িল ইবনে হারিসের সঙ্গে। বিচ্ছেদের পর তুফায়িলের ভাই উবায়দা তাঁকে বিয়ে করেন।বদর যুদ্ধে উবায়দা শহীদ হলে নবী সাঃ তাঁকে বিবাহ করেন।।বিয়ের মাএ দু মাস পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি উম্মুল মাসাকিন বা নিঃস্বদের মা নামে পরিচিত ছিলেন।

উম্মু হাবিবা বিনতু আবু সুফিয়ান

তিনি আবু সুফিয়ান রাঃ এর মেয়ে ছিলেন। প্রথমে তাঁর বিয়ে হয় ওবায়দুল্লাহ ইবনু জাহাশের সাথে। সেখানে তাঁর একটি সন্তান ও হয়। তাঁরা উভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ওবায়দুল্লাহ ইবনু জাহাশ খ্রিস্টান হয়ে যায়। কিন্তু উম্মু হাবিবা তাঁর দ্বীনের প্রতি অটল থাকেন। তখন নবীজি সাঃ হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশিকে চিঠি লিখে উম্মু হাবিবাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। নবীজি সাঃ এর চিঠি পেয়ে বাদশাহ উম্মু হাবিবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং ৪০০ দিনার মোহর আদায় করেন। বিয়েতে তাঁর অভিভাবক ছিলেন খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস রাঃ। ৬৫ টি হাদিস তাঁর থেকে বর্ণিত আছে এবং ৪৪হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

উম্মু সালামা

তিনি হিন্দা পরিচিত ছিলেন। আবু সালামা ইবনু আব্দুল আসাদের সঙ্গে প্রথমে তাঁর বিবাহ হয় ।তাঁদের সন্তানাদিও হয়।তিনি হাবশা ও মদিনায় হিজরত করেন। চতুর্থ হিজরীতে তাঁর নবীজি সাঃ এর সঙ্গে বিবাহ হয়। ৩৭৮ টি হাদিস তাঁর থেকে বর্ণিত আছে। তিনি ৮৪ বছর বয়সে ৬৩ হিজরিতে মারা যান। উম্মাহাতুল মু্‌ৃমিনিনের দের মধ্যে তিনি সবার শেষে ইন্তেকাল করেন।

জায়নাব বিনতু জাহাশ

নবীজির তিনি ফুফাতো বোন ছিলেন ।তাঁর মায়ের নাম ছিল উমাইমা বিনতু আব্দুল মুত্তালিব। জায়েদ ইবনু হারিসার সঙ্গে নবীজির আদেশ রক্ষার্থে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। জায়েদ ছিলেন নবী সাঃ এর আজাদকৃত দাস। নবী সাঃ তাঁকে পালক পুএর মর্যাদা দেন।জায়নাব কখনো আত্মমর্যাদা এবং বংশ গৌরবের কথা ভেবে তাকে মেনে নিতে পারেনি। শুধু নবীজি সাঃ এর আদেশে তাঁকে বিবাহ করেন। এক বছর পর্যন্ত এ বিবাহ স্থায়ী হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না ফলে সবসময় অশান্তি

লেগেই থাকতো। তাঁর মানসিক অস্থিরতার বিষয়টি বুঝতে পেরে জায়েদ নিজেই নবীজি সাঃ এর কাছে তাঁকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নবীজি সাঃ তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিরত রাখেন। তারপরেও তাঁদের মধ্যে বনিবনা না হলে জায়েদ বাধ্য হয়ে তাঁকে তালাক দেন। জায়নব রাঃ যখন এ বিবাহ থেকে মুক্ত হয় তখন নবীজি সাঃ এর সাথে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হলে নবীজি সাঃ এ বিবাহ থেকপ তখন বিরত থাকেন। কারণ আরব সমাজে তখন পালক পুত্রকেও ঔরসজাত সন্তানের মতই মনে করা হতো। সাধারণ মানুষ এর মনোভাব রক্ষা করার জন্য তিনি বিরত থাকেন,তাঁর পুত্রবধূকে বিয়ে করছেন এটা ভেবে। কিন্তু এটা যে আসলে জাহিলি যুগের একটা কুসংস্কার তা নির্মূল করার জন্য আল্লাহ সুবহানা তাআলা সূরা আহযাবের বলেন

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ انْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي

أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

আর স্মরণ করো, আল্লাহ যার ওপর নিয়ামত দিয়েছিলেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলে, তুমি যখন তাকে বলেছিলে, 'তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো।' আর তুমি অন্তরে যা গোপন রাখছ, আল্লাহ তা প্রকাশকারী এবং তুমি মানুষকে ভয় করছ অথচ আল্লাহই অধিকতর হকদার যে, তুমি তাঁকে ভয় করবে; তারপর জায়েদ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে বিয়েসম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাঁকে তোমার সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে পালকপুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে; যখন তারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে বিয়েসম্পর্ক ছিন্ন করে। আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়ে থাকে। আপনি কি লোকদের ভয় করছেন? অথচ আল্লাহকে ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত। [সুরা আহজাব: ৩৭]

পালকপুএ নিজের সন্তানের মত নয়। পালক পুএর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর সেই স্ত্রী তাঁর পিতার জন্য হারাম হয়ে যায় না। এই কুসংস্কার দূর করাই ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্য। নবী সাঃ যখন নিজে এটা করবেন তখন সব ক্ষেত্রে এটা বন্ধ করা সম্ভব ছিল।যারা হালাল বিধানকে হারাম করেছে তারা যেন পরবর্তীতে এটা না করে এটাই ছিল রবের উদ্দেশ্য এ বিয়ের মাধ্যমে। পঞ্চম চতুর্থ অথবা তৃতীয় হিজরীতে আল্লাহর

আদেশে রাসুল সাঃ তাঁকে বিয়ে করেন। জায়নাব বিনতু ২০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।তাঁর থেকে নয়টি হাদিস বর্ণিত আছে।

সাফিয়া বিনতু হুয়াই

তিনি প্রথমে কিনানা ইবনু আবিল হুকাইকের স্ত্রী ছিলেন।খায়বার বিজয়ের সময় তিনি নিহত হলে সাফিয়া যুদ্ধবন্দী হয়ে মদীনায় আসেন।তিনি হারুনুর রশীদের বংশধর ছিলেন।কুরায়জা ও নাযির উভয় গোত্রের সরদারের মেয়ে ছিলেন তিনি।তিনি এক নবীর বংশধর আর আরেক নবীর স্ত্রী ছিলেন।তাঁর সম্পর্কে জানতে পেরে নবীজি তাঁকে মুক্ত করে বিয়ে করেন।তিনি ১০ টি হাদিস বর্ননা করেছেন।৫০ হিজরীর রমাদ্বানে তিনি ইন্তেকাল করেন।

জুওয়াইরিয়া বিনতু হারিস খুজাইয়া

তিনি বনু মুসতালিকের সরদার হারিসের মেয়ে ছিলেন।যুদ্ধবন্দী হয়ে নবীজি সাঃ এর কাছে আসেন। নবীজি সাঃ তাঁকে বিবাহ করলে তাঁর গোত্রে সবাই মুক্তি পেয়ে মুসলমান হয়ে যায়। তিনি ৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরন করেন।তাঁর থেকে পাঁচটি হাদিস বর্নিত আছে।

মাইমুনা বিনতু হারিস হিলালিয়া

মাসউদ ইবনে উমারের স্ত্রী ছিলেন তিনি।পরবর্তী তে তাঁর থেকে তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পরে রিহামের সঙ্গে বিয়ে হয়।রিহামের মৃত্যুর পর ৭ম হিজরীতে নবীজি তাঁকে বিবাহ করেন। তিনিই নবীজির শেষ স্ত্রী। ৭৬ টি হাদিস তিনি কর্তৃক বর্নিত আছে। ৫১ হিজরিতে মাইমুনা রাঃ মৃত্যুবরন করেন।

রাসূলের জীবনের মিশন ছিল ইসলাম প্রচার ইসলামের প্রসার ঘটানো আর ইসলামের প্রতিষ্ঠা করা। তিনি যা কিছু করেছেন এমনকি বৈবাহিক জীবনের সিদ্ধান্তগুলো ইসলাম প্রচারের স্বার্থেই করেছেন। যেমন জুওয়াইরিয়াকে বিয়ে করার ফলস্বরূপ বনু মুস্তালিক গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। সাহাবীদের দেখাশুনা করার জন্য যেমন সাওদাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। সাওদা বিধবা ছিলেন। ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সঙ্গে সম্পর্ক আরো গভীর করার জন্য। রাসূল সাঃ এর সাহাবীদের সাথে সম্পর্ক ছিল ভাইয়ের মতো। তিনি এই ইসলামের ভাতৃত্ব কে আত্মীয়তা সম্পর্কে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। দুইজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী উমার ও আবু বকর রাঃ এর কন্যাগনকে বিবাহ করেছিলেন । দ্বীনের

শিক্ষা পরিপূর্ণ করার জন্য নবীজি সাঃ এর একাধিক বিয়ের প্রয়োজন ছিল। নবীজি সাঃ আমির হিসেবে কেমন ছিলেন ইমাম হিসেবে কেমন ছিলেন এগুলো বলার জন্য অনেক সাহাবী ছিল কিন্তু রাসুল সাঃ এর পারিবারিক জীবন কেমন ছিল তাঁর বর্ণনা কেবল তাঁর স্ত্রীদের কাছ থেকেই জানা যায়। ইসলাম পূর্ব যুগে বহুবিবাহের কোন শর্ত আরোপ করা ছিল না ফলে একজন পুরুষের অধীনে অনেক মহিলা থাকতো। এবং মহিলাদের অধিকার এতে ক্ষুন্ন হচ্ছিল। বেদ গ্রন্থে ও একই সময় **১০** জন, **১৩** জন,এমনকি **২৭** জন স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে বলে উল্লেখ ছিল। প্রথমে লোভের বশবর্তী হয়ে অনেকে বহুবিবাহ করে ফেলত। এরপর তাদের সবার অধিকার ঠিকমতো পূরণ করতে পারত না। কুরআনে পৃথিবী তে এসেছে জুলুম অত্যাচার থেকে পৃথিবী কে মুক্ত করতে। মানুষের স্বভাবজাত প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্য রেখে বহুবিবাহ একবারে নিষেধ না করে সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন

“” এখন থেকে

তোমরা শুধু চারজন নারীকে একই সময়ে বিয়ে করতে পারবে, আর তাও এই শর্তে যে যদি তোমরা চারজন স্ত্রীর অধিকার সমানভাবে আদায় করতে সক্ষম হও আর যদি এর সাহস ও ক্ষমতা না থাকে তাহলে একের অধিক স্ত্রী রাখা অন্যায় ও জুলুম। তখন যে সকল সাহাবীর অধীনে চারজনের অধিক স্ত্রী ছিলেন তারা নবীজির নির্দেশে চারজন রেখে বাকি স্ত্রী দেরকে তালাক দিয়ে দেন। নবীজি সাঃ এর পুতপবিত্র স্ত্রীর সংখ্যা চারের অধিক ছিল। কিন্তু উম্মাহাতুল মুমিনীনগন গণ অন্যান্য নারীর মতে নন। উম্মাতের মা। এজন্য তাঁরা নবী সাঃ এর মৃত্যুর পরেও অন্য কারোর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেননা। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ঘোষণা আছে

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

হে নবিপত্নীরা, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। [সুরা আহজাব : ৩২]

নবুয়াত লাভ

সদগুনাবলীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য ই ছিল রাসুল সাঃ এর পুরো জীবন জুড়ে। অন্যায়, অনাচার অশ্লীলতা, সবকিছুর মাঝে বসবাস করে ও সবকিছুর ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি। তিনি কখনো মূর্তি পূজা করেননি, শরাবপায়ী ভাইদের সাথে থেকে ও কখনো শরাব পান

করেননি। রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন ইবনে আসিরের একটি বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আইয়ামে জাহেলিয়াতের লোকেরা যে সকল কাজ করেছে দুবার ছাড়া আর কখনো সে ব্যাপারে আমার খেয়াল জাগেনি। কিন্তু সে দুবারের বেলায় আল্লাহ তায়ালা আমার এবং সে কাজের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এরপর কখনো সে ব্যাপার সম্পর্কে আমার কোন খেয়াল জন্মে নেই যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা আমাকে পয়গম্বরীর মর্যাদা প্রদান করেছেন। এক বালকের সঙ্গে মক্কার উপরিভাগে ছাগল চড়াতাম। এক বার তাকে বললাম তুমি আমার ছাগল গুলো একটু দেখাশোনা করো, আমি মক্কায় যাই এবং সেখানে অন্যান্য যুবক গনের মত আবৃত্তি অনুষ্ঠানে যোগদান করি। সে বলল ঠিক আছে এরপর আমি বের হলাম তখনও মক্কার প্রথম ঘরের নিকটে ছিলাম এবং কিছু বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আমার কানে এসে পৌঁছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ কোথায় থেকে আসছে। অমুক লোকেরা বলল অমুকের বিবাহ হচ্ছে তাই। আমি শোনার জন্য সেখানে বসে পড়লাম। আল্লাহ তায়ালা আমার শ্রবনশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন। তিনি আমার কান বন্ধ করে দিলেন এবং আমি শুয়ে পড়লাম। তারপর সূর্যের তাপে পরের দিন সকালে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং আমি আমার সেই বন্ধুর কাছে গিয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। রাসুল সাঃ এর বয়স যখন ৪০ বছর তখন তার দ্বিনের বিচার,বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তার দ্বার সবার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল এবং তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠছিলেন। মূলত তাঁর নির্জনতা প্রিয় হয়ে ওঠার কারণ ছিল আল্লাহ তাঁকে প্রস্তুত করছিলেন। তিনি খাবার ও পানি সাথে নিয়ে মক্কা হতে দুই মাইল দূরত্বে অবস্থিত নূর পর্বতের হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন। এই গুহার আকার আয়তন ছিল খুবই ক্ষুদ্র। দৈর্ঘ্য ছিল চার গজ এবং প্রস্থ পৌনে দুই গজ। পুরো রমাদ্বানে রাসুল সাঃ হেরাগুহায় অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন। যিনি মানুষের পথপ্রদর্শক হবেন পথভ্রষ্ট জাতিকে সঠিক নির্দেশনার প্রদান করবেন তাঁর জীবনের সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নির্জনতা অবলম্বন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম। নবীর বয়স যখন ৪০ বছর পূর্ণ হল তখন ছিল পয়গম্বরগনের নবুওতপ্রাপ্তির উপযুক্ত বয়স।তখন কিছু লক্ষণ স্পষ্ট হতে থাকলো। যে লক্ষণগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিল, তিনি যখনি কোন স্বপ্ন দেখতেন সেটাই সুবহে সাদিকের সত্যি হত। এমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাঁর ছয়টি মাস অতিবাহিত হয়। নবুওয়তের সময়সীমা ছিল২৩ বছর।তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর। তারপর আল্লাহ রাব্বুল

আলামীন জিব্রাইল আঃ এর মাধ্যমে কুরআনুল কারীমের কয়েকটি আয়াত নাজিল করে তাঁকে নবুওয়তের মর্যাদা প্রদান করেন। এ ব্যাপারে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে

“”তিনি বলেন রাসুলে সাঃ এর নিকট ওহি অবতীর্ণ হয়েছিল ঘুমের অবস্থায় স্বপ্নযোগে, তিনি যখন যে স্বপ্ন দেখতেন তা একদম সত্যি প্রভাত রশ্মীর মত প্রকাশিত হতো। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জন প্রিয় হতে থাকলেন। কোন সময় গৃহে না ফিরেও পরের দিন ইবাদত বন্দেগী করে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। একদিন তিনি যখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তখন জিব্রাইল আঃ তাঁর নিকট আগমন করে বললেন তুমি পড়ো। তিনি বললেন পড়ার অভ্যাস আমার নেই তারপর তিনি তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন তুমি পড়ো।তিনি বললেন আমার পড়ার অভ্যাস নেই, তারপর তৃতীয় দফায় আমাকে আলিঙ্গন করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন।

اقرا باسم ربك الذي خلقه خلق الانسان من القى

অর্থঃ পড়ো সেই প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের রক্ত পিণ্ড থেকে।

তারপর ওহীর আয়াত গুলো নিজের মধ্যে ধারণ করে খাদিজা রাঃ এর কাছে ছুটে গেলেন এবং বললেন আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর।খাদিজা রাঃ তাঁকে শায়িত অবস্থায় বস্ত্রাবৃত করলেন। তারপর কিছুক্ষণ পর শান্ত হয়ে তিনি বললেন আমার কি হলো এবং হেরা গুহার ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। খাদিজা তাঁর অস্থিরতা দেখে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন যে আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না। কেননা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আপনি সুসম্পর্ক রেখে চলেন, অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচন করেন, অসহায়দের আশ্রয় প্রদান করেন, অতিথিদের আতিথিয়তা করেন, ঋণগ্রস্থদের ঋণের দায় মেটাতে সাহায্য করেন, যারা সত্যের পথিক আপনি তাঁদেরকে সবসময়ই সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অপদস্ত করবেন না। তারপর খাদিজা তাঁর চাচাতো ভাই অরাকা বিন নাওফাল বিন আসাদ বিন আব্দুল উযযার নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং ইবরানী ভাষা পড়তে ও লিখতে জানতেন। তাঁকে বললেন ভাইজান আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।ওরাকা জিজ্ঞেস করলেন তোমার কি হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাঃ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি

শুনে বিস্মৃত হয়ে বললেন তিনি তো সেই জিব্রাইল আঃ যিনি মুসা আঃ এর কাছে এসেছিলেন। তারপর তিনি বলতে থাকেন

“হায়! আমি যদি সেদিন পর্যন্ত জীবিত থাকতাম যেদিন আপনাকে আপনার নিজের জাতির লোক দেশ থেকে বিতাড়িত করবে।। আরো বললেন শুধু আপনি নয় যুগে যুগে যারাই সত্যের বাহক হয়ে এসেছেন, তাদেরকে সবাই প্রত্যাখ্যান করেছে। মনে রাখুন যদি আমি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবো। অবশ্য তার কিছুদিন পর তিনি মারা যান।এর কিছু সময় পর ওহী আসা ও বন্ধ হয়ে যায়।

ওহী বন্ধ

ওহী মোট কতদিন বন্ধ ছিল এ ব্যাপারে সঠিক জানা যায় নি। নবুওয়তের পূর্বে রাসূল সাঃ হেরাগুহায় একমাস ধ্যানমগ্ন ছিলেন। বুখারী মুসলিমের বর্ণনা হতে জানা যায় যে,ওহী বন্ধ হওয়ার পর দ্বিতীয়বার ওহী অবতীর্ণ হয় রাসুল সাঃ যখন নির্জনে পুরো মাস অবস্থানের পর ফিরে আসেন। ওহী বন্ধ হলে রাসূল সাঃ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। বুখারী থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহি বন্ধ হলে রাসূল সাঃ এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েন যে পর্বত শিখর হতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য তিনি মনস্থির করে ফেলতেন। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে যখনই পর্বতে তিনি আরোহন করতেন তখনই জিব্রাইল আঃ তাঁর দৃষ্টি গোচর হয়েছেন। জিব্রাইল আঃ তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আপনি আল্লাহর সত্য নবী , এ কথা শুনে তাঁর সমস্ত অস্থিরতা নিমিষেই দূর হয়ে যেত।আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা পবিএ কোরআনে এ সম্পর্কে বলেন

مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং অসন্তুষ্টও হননি

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولٰى

আর অবশ্যই তোমার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে উত্তম।

পুনরায় ওহী সহ জিব্রাইলে আঃ এর আগমন

নবী সাঃ এর নিকট ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হলে তিনি অনেক চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি যেন মানসিক শক্তি কিছুটা ফিরে পান এবং তাঁর ভয়ভীতি যেন কেটে যায় এবং ওহী ধারনের জন্য উপযুক্ত হন, সেজন্য আল্লাহ সুবহানাতায়ালা কিছুদিন ওহি নাযিল বন্ধ রাখেন। তারপর যখন তিনি স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন , মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠলেন তখন জিব্রাইল আঃ পুনরায় ওহী নিয়ে আগমন করলেন।এ প্রসঙ্গে জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত রাসুল সাঃ বলেন

)جَاوَرْتُ بيرَاءٍ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِى هَبَطْتُ فَلَمَّا اسْتَبْطَنَتُ الْوَادِي فَنُودِيَتُ، فَنَظَرْتُ عَنْ يُمِيْنِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ أَمَانِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاء جَالِسٌ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُبْنْتُ مِنْهُ رُعْبًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: [زَمَلُوْنِي، زَمِلُونِي، دَلِرُونِي، وَصُبُوا عَلَى مَاءً بَارِدًا) ، قَالَ : (فَدَثْرُونَ وَصَبُّوا عَلَى مَاءً

باردًا، فَنَزَلَتْ : يَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبَر وَلِيَابَكَ فَظَهِرُ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) [المدثر : ٥:١])98

"আমি পথ ধরে চলছিলাম এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ আমার শ্রুতিগোচর হল। আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই আমি সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম যিনি আমার নিকট হেরা গুহায় আগমন করেছিলেন। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে কুরসীতে উপবিষ্ট ছিলেন। ভয়ে বিস্ময়ে আমার দৃষ্টি অবনত হয়ে এল। তারপর আমার সহধর্মিণীর নিকট এসে বললাম, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' তিনি আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)। - ওঠ, সতর্ক কর। - আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক।" (মুদ্দাস্সির (৭৪): ১

এরপর থেকে অবিরামভাবে ওহী অবতীর্ণ হতে থাকে।'

দ্বীনের পথ কখনোই মসৃণ নয়। সে পথে মানুষকে ডাকা বা নিজে চলা সেটাও মসৃণ নয়। অনেক দুঃখ, কষ্ট, নিপীড়ন, অত্যাচার সবকিছু সহ্য করে মেনে, মানুষকে ডাকতে হয়,এ পথে চলতে হয়। এত বড় দায়িত্বের বোঝা,সমগ্র মানবতার বোঝা যাঁর কাঁধে চাপাবেন রব চেয়েছেন তাঁকে আগে প্রস্তুত করতে।
আল্লাহ বলেন

يا ايها المدثر قم فانزل

হে বস্রাবৃত ওঠো এবং সতর্ক করো।(সূরা মুদ্দাসছির)
যারা অন্য কে নিয়ে ভাবে তাদের সুখের সাগরে গা ভাসিয়ে থাকা যায়না, রব এ জন্য রাসুল সাঃ কে বলছেন ওঠো এবং সতর্ক করো। ওহী বন্ধ থাকা ও তাঁর ই পরিকল্পনার ই অংশ ছিল। দুইভাবে ওহি রাসুলের নিকট আসতো। প্রথম প্রকারে তিনি পেতেন স্বপ্ন যোগে। দ্বিতীয় প্রকারে জিব্রাইল আঃ তাঁর কাছে আসতেন। প্রথম প্রকারে নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর কাছে ওহী অবতীর্ণ হতো। আর দ্বিতীয় প্রকারে অদৃশ্য অবস্থায় থেকে রাসূলের অন্তরে প্রবেশ করে করিয়ে দেন জিব্রাইল আঃ। এ প্রসঙ্গে নবী সাঃ বলেন

)إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْعَن أَنَّهُ لَنْ تَمُوْتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْيِلَ رِزْقُهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَحْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا

يحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاء الرِّزْقِ عَلى أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يَنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِه(ِ

অর্থ: 'জিবরাঈল (৪৪) ফেরেশতা আমার অন্তরে এ কথা নিক্ষেপ করলেন যে, কোন আত্মা সে পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যে পর্যন্ত তার ভাগ্যে যতটুকু খাদ্যের বরাদ্দ রয়েছে পুরোপুরিভাবে তা পেয়ে না যাবে।

অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর,রিজিক নিয়ে পেরেশান হয়োনা।রিজিক অন্বেষণের জন্য ভালো পথ অবলম্বন করো।

মানুষ হিসেবে নবীজি যেমন অসাধারণ ছিলেন তেমন উত্তম আখলাকের ব্যাপারেও তেমন অনুসরনীয় ছিলেন তিনি।

স্ত্রী দের সাথে যেমন ছিলেন তিনি

স্ত্রী দের সাথে সব পরিস্থিতি তেই উত্তম ও ধৈর্য্যশীল আচরন করতেন রাসুল সাঃ। সব স্ত্রী দের হক আদায়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যান্ত সচেতন। বাসায় প্রবেশ করে প্রথমে তিনি মেসওয়াক করতেন যেন কেউ দুর্গন্ধ না পান।
। সুরায় ইবনে হানী রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশাকে রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, "বাসায় ঢুকে নবীজি প্রথম কোন কাজ

- করতেন?" তিনি উত্তরে বললেন, "মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন।" "

সুয়ূতী রাহ. বলেন, "তাঁর এরকম অভ্যাসের পেছনে কারণ ছিল সারাদিন বাইরে কথা বলে তাঁর মুখের গন্ধ বদলে যেত। স্ত্রীদের সাথে সুন্দরতম ব্যবহারে রাসূল এতটাই যত্নবান ছিলেন যে, এই সামান্যতম দুর্গন্ধ না রাখার ব্যাপারেও তিনি খেয়াল রাখতেন।
স্ত্রী দের ঘরের কাজেও তিনি সাধ্যমত সহযোগিতা করতেন।নিজে হাতে ভেঁড়ার দুধ দহন করতেন, নিজের বস্ত্র নিজে সেলাই করতেন।স্ত্রী দের অনুভূতির ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট সজাগ ছিলেন,
নবীজি স্ত্রীদের মন ভালো কিংবা খারাপ আছে কি না খেয়াল রাখতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ।

আয়িশাকে রাযি. বললেন, "আমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারি, কখন তুমি আমার উপর খুশি থাক, আর কখন মন খারাপ করে থাক।" আয়িশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, "কীভাবে বুঝতে পারেন?" তিনি ও উত্তর দিলেন, "যখন তুমি সন্তুষ্ট থাক, তখন শপথের সময় বল, 'মুহাম্মাদের রবের কসম', আর যখন মন খারাপ কর, তখন বলো, 'ইবরাহীমের রবের কসম।" আয়িশা রাযি. বললেন, "হ্যাঁ, (আপনি ঠিক ধরেছেন) আল্লাহর রাসূল, সে ক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি।"

আল্লাহর রাসূলকে রাষ্ট্র দেখাশোনা, যুদ্ধ, সৈন্যবহরের প্রস্তুতি, আল্লাহর বাণী পৌঁছানো, বিভিন্ন দেশে দূত পাঠানোসহ নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো। এত-শত ভারী ভারী

দায়িত্বের চাপে থেকেও তিনি স্ত্রীদের খোঁজ নিতে ভুলতেন না, তাদের অনুভূতিগুলোর ব্যাপারে সচেতন থাকতেন।

স্ত্রীদের অনুভূতির ব্যাপারে তাঁর যত্নের আরেকটি ঘটনা এভাবে বর্ননা করা হয়েছে যে, তাঁর দুই স্ত্রীর মাঝে একবার মনোমালিন্য হলো। হাফসা রাযি. সাফিয়্যাকে রাযি. ইহুদীকন্যা বলায় সাফিয়্যা কষ্ট পেলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে নবীজির কাছে অভিযোগ জানালেন। নবীজি সাঃ তাঁর পক্ষ নিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা জানালেন এবং তাঁর কথা শুনে সাফিয়্যা খুশি হয়ে গেলেন।

যে আচরণ গুলো অনুপুযুক্ত তিনি তাঁর স্ত্রী দের সে আচরনগুলো ও সহ্য করতেন।এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা এভাবে বর্নিত আছে যে,

নুমান ইবনে আল-বশির থেকে বর্ণিত, "আবু বাকর রাযি. আল্লাহর রাসূলের ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এ-সময় বাইরে থেকে তিনি শুনতে পেলেন আয়িশা রাযি. রাসূলুল্লাহর চেয়ে উঁচু গলায় কথা বলছেন। ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে তিনি আয়িশাকে রাযি. (কিছুটা রাগান্বিত হয়ে) নিজের দিকে টেনে বললেন, "তোমার সাহস কত! আল্লাহর রাসূলের সাথে উঁচু গলায় কথা বল!" আল্লাহর রাসূল (তাকে রক্ষা করার জন্য) তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবু বাকর রাযি. চলে গেলে রাসূলুল্লাহ তাকে (সান্ত্বনা দিয়ে) বললেন, "দেখলে, কীভাবে তোমাদের মাঝে এসে তোমাকে রক্ষা করলাম!" কিছুক্ষণ পর আবু বকর রাঃ ফিরে এসে তাঁদের দুজনকে হাস্যোজ্জ্বল দেখলেন। আবু বকর রাঃ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনাদের যুদ্ধে যেমন শরিক হয়েছিলাম, আপনাদের খুশিতেও তেমনি আমাকে শরিক করুন।""

নিজের শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও সুবাসের প্রতি ও তিনি যত্নশীল ছিলেন।সুগন্ধি নবীজি সাঃ অনেক পছন্দ করতেন। বাহনে চড়তেও তিনি তাঁর স্ত্রী দের সাহায্য করতেন,

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, "একবার দেখলাম, সাফিয়্যা রাযি. উটে ওঠার চেষ্টা করছেন। এটা দেখে নবীজি তাকে তাঁর নিজের গাউন দিয়ে ঢেকে দিলেন (যেন ওঠার সময় আওরাহ অসাবধানতাবশত উন্মুক্ত হয়ে না পড়ে), তারপর উটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন, যেন তাঁর হাঁটুর ওপর পা রেখে তিনি উটে উঠতে পারেন।" "

এ থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীদের সাথে নবীজির আচরণ কতটা কোমল ও ভালোবাসাপূর্ণ ছিল।

ঘরের কাজে ও উম্মুল মুমীনিন দের তিনি বিনা সংকোচে সাহায্য করতেন,

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, আয়িশাকে রাযি. জিজ্ঞাসা করা হলো, 'রাসূলুল্লাহ বাড়ির ভেতরে কী কী কাজ করতেন?" তিনি জবাব দিলেন, নবীজি স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করতেন এবং সালাতের সময় হলে উঠে চলে যেতেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "নবীজি তো একজন মানুষই ছিলেন, যিনি নিজেই নিজের জামা সেলাই করতেন,দুধ দহন করতেন,নিজের জামা নিজে ধুতেন,পুরুষরা সচারাচর যেসব কাজ বাসায় করে থাকে তার সবই তিনি করতেন।কখনো স্ত্রী দের প্রহার করেননি, সবসময় সদাচার করেছেন।এমনকি বিদায় হজের ভাষনের সময় ও নারীদের প্রতি সদাচারনের নির্দেশ দিয়েছেন।

নবীজির দিনলিপি

রাসুল সাঃ মধ্যরাতে বা এর কিছু আগে ঘুম থেকে উঠে

মেসওয়াক করে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরান এর ১৯০-২০০ আয়াত পাঠ করতেন।

অতঃপর উযু করতেন।

এরপর কিছুক্ষণ যিকর করে ২ রাকাত সংক্ষিপ্ত সালাত দিয়ে কিয়ামুল লাইল শুরু করে রাতের ১/৬ বাকি থাকতে তিনি সামান্য বিশ্রামের জন্য বিছানায় ডান কাত হয়ে ডান হাতের তালুতে গাল রেখে শুয়ে থাকতেন।

আযানের শব্দে তিনি উঠে যেতেন এবং আযানের জবাব দিতেন।

এরপর ফজরের ২ রাকাত সুন্নাহ আদায় করতেন এবং মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হতেন ফজরের সালাত আদায় করে তিনি যিকরে মশগুল হতেন।

যিকিরের পর সাহাবীদের নিয়ে বসতেন এবং তাঁদের কথোপকথন শুনতেন কখনও কখনও সাহাবীদের স্বপ্নের বাখ্যা দিতেন, কেউ অসুস্থ থাকলে তার খবর নিতেন।এভাবে তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদেই অতিবাহিত করতেন।

মসজিদ থেকে বের হয়ে একে একে সকল স্ত্রীর কক্ষে যেতেন এবং তাঁদেরকে সালাম দিতেন, তাঁদের জন্য দূয়া করতেন।সকল স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে পুনরায় তিনি মসজিদে ফিরে আসতেন এবং ২ রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন।

এরপর সাহাবীদের সাথে আলাপ করতেন, তাদেরকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন ও শিক্ষা দিতেন, নাসীহা করতেন।

জরুরী মূহুর্তে এই সময়টায় পরামর্শসভা বসত। মজলিস শেষে সাহাবীগণ কেউ কেউ জীবিকার কাজে বেরিয়ে পড়তেন,

বেদুইনরা দ্বীন সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে এসময়ে আসত এবং মদীনার বাইরের প্রতিনিধিদল ও এসময়ে আসতেন।

কেউবা বাসায় বিশ্রাম নিতেন।

নবীজি কখনও বাসায় বিশ্রাম নিতে যেতেন, কখনও মদীনার রাস্তায় হাঁটতেন।

কারও দাওয়াত থাকলে দাওয়াত রক্ষা করতে যেতেন বা কেউ অসুস্থ থাকলে তাকে দেখতে যেতেন।

সকালের শেষে দুপুর গড়িয়ে এলে নবীজি স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে থাকার পালা থাকত তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন।
ঘরে ঢুকে মিসওয়াক করে সবাইকে সালাম দিতেন।
এরপর দুহার সালাত আদায় করতেন এবং নাস্তা করতেন।
এই সময়টায় পরিবারের সাথে একান্তে কাটাতেন।
অন্য মুসলিমা নারীগণ মেয়েদের ব্যক্তিগত মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে আসতেন এই সময়।
কখনও কখনও ঘনিষ্ঠ সাহাবীগণ আসতেন।
নবীজি সাংসারিক কাজ করতেন এই সময়। তিনি নিজের জুতা ও কাপড় সেলাই করতেন, নিজ হাতে ছাগলের দুধ দোহন করতেন।
যুহরের সালাতের আগ পর্যন্ত হালকা একটু ঘুমিয়ে নিতেন।
যুহরের আযান শেষে
উযু করে তিনি যুহরের ৪ রাকাত সুন্নাহ সালাত ঘরেই আদায় করতেন।এসময় মাঝে মাঝে হাসান-হুসাইন তাঁর সাথে খেলতে আসত।
যুহরের জামাতের জন্য বিলাল (রা) ডাক দিলে তিনি মসজিদে যেতেন।
কখনও আবার হাসান বা হুসাইনকে কোলে নিয়েও মসজিদে যেতেন।
সালাতের পর সাহাবীদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং তাদেরকে নাসীহা করতেন। কখনও কখনও এই সময়ে মদীনার বাহির থেকে প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে দেখা করতে আসত। এরপর ঘরে ফিরে যুহরের ২ রাকাত সুন্নাহ সালাত আদায় করে কিছুক্ষণ পর আবার চলে যেতেন।
আসর পর্যন্ত তিনি বহুবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাতেন।
আসরের সালাত আদায় করে সাহাবীদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং কখনও কখনও খুব সংক্ষিপ্ত নাসীহা করতেন। আসর সালাত শেষে তিনি একটু তুলনামূলক কম কথা বলতে সালাত শেষে তিনি স্টেজের সাথে সাক্ষাৎ করতেন তারপর যেদিন যার ঘরে থাকার পালা থাকতো সেখানে যেতেন কিংবা সকল স্ত্রী মিলে সে ঘরে আসতো। তিনি তাঁদেরকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এ সময়ে। তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন। মাগরিবের সালাতের পর তিনি সাধারণত সাহাবীদের সাথে বেশি কথা বলতেন না, ঘরে ফিরে দুই রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করতেন। এরপর রাতের খাবার গ্রহণ করতেন তবে রোজা রাখলে মাগরিবের সালাতের পূর্বে ইফতার করে

নিতেন আর ঘরে পর্যাপ্ত খাবার মজুদ থাকলে তিনি অন্তত পক্ষে ১০ জন সাহাবী নিয়ে খাবার খেতেন।যদিও তিনি বেশিরভাগ সময় অভুক্তই থেকেছেন। এশার সালাতের আগের সময় পর্যন্ত নবীজি ঘরে থাকতেন। এশার সালাতের পর খুবই কম কথা বলতেন। কথা বললে খুবই সংক্ষিপ্ত কথা বলতেন। ইশার সালাত শেষে ঘরে ফিরে দুই রাকাত সুন্নত আদায় করতেন। এরপর স্ত্রী দের সাথে গল্প করে সময় কাটাতেন। ঘুমানোর পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করে ঘুমের দোয়া পড়ে ঘুমিয়ে যেতেন। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে পুনরায় ঘুমানোর পূর্বে মেসওয়াক করে নিতেন। তিনি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতেন।

নবীজির রমাদ্বান

রাত বাঁকি থাকতেই তিনি রমাদ্বানের নিয়াত করে নিতেন।সুনানে আন নাসাই এর বিশুদ্ধ গ্রন্হ থেকে বর্নিত রাসুল সাঃ বলেন,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَه "যে ব্যক্তি ফজর উদয়ের পূর্বে, রাতেই রোযার নিয়্যাত করেনা, তার রোযা হবে না।" (সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস নং ২৩৩২)

সেহেরী খাওয়ার মধ্যে ও বরকত রয়েছে। তিনি একটু দেরী করে সাহরী সেরে নিতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَر "আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সেহেরী খাওয়া।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০৪)

তিনি ইফতার সঠিক সময় অনুযায়ী তাড়াতাড়ি গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছেন,।

সূর্য অস্ত যাওয়া নিশ্চিত হলে তাড়াতাড়ি ইফতার করা রোযাদারের জন্য মুস্তাহাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অনতিবিলম্বে ইফতার করবে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৫৬ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০৮)

নবী সাঃ এর ইফতারি প্রসঙ্গে আনাস রাঃ বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'রুতাব' (শুকনা নয় এমন) খেজুর দিয়ে নামাযের আগে ইফতার করতেন, রুতাব পাওয়া না গেলে শুকনা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাও পাওয়া না গেলে তিনি কয়েক ঢোক পানি পানে ইফতার করতেন।" (উত্তম সনদে ইমাম আহমাদ, হাদীস নং ১২৬৭৬ ও আবু দাউদ, হাদীস নং ২৩৫৬)

. রোযাদারকে ইফতার করানো প্রসঙ্গে রাসুল সাঃ বলেন

সহীহ সনদে তিরমিযী ও আহমাদ বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْء

"যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, সে উক্ত রোযাদারের সাওয়াবের কোনরূপ ঘাটতি না করেই,
তার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে।" (সুনান তিরমিযী,) ও (মুসনাদ আহমাদ,) রমাদ্বান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় ক্বদরের রাত্রিতে (নামাযে) দাঁড়ায়, তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হল"। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮০২)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের শেষ দশ রাতে নিজে লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতেন এবং পরিবার পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন। ইমাম মুসলিম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ في غَيْرِه

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের শেষ দশদিনে আল্লাহর ইবাদাতে এতটা পরিশ্রম করতেন যা তিনি অন্য সময় করতেন না"। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৪৫)

আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা ও ব্যয় করা সবসময়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ন ইবাদাত।রাসুল সাঃ রমাদ্বানে বেশি বেশি দান সাদাকাহ করার তাগিদ দিয়েছেন।কেননা ইমাম বুখারী ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ...... فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মানুষের চেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন। আর রামাদান মাসে যখন জিবরীল তার সাথে সাক্ষাতে মিলিত হতেন তখন তিনি আরো দানশীল হয়ে
উঠতেন.....। জিবরীলের সাক্ষাতে তিনি বেগবান বায়ুর চেয়েও বেশী দানশীল হয়ে উঠতেন"। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৪৮)

রামাদান মাসের শেষ দশদিন ইতেকাফে বসা অতি উত্তম ইবাদাত। শুরুতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের প্রথম দশদিন ইতেকাফে বসেন। এরপর লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধানে মাঝের দশদিন ইতেকাফে বসেন। এরপর যখন লাইলাতুল কদর শেষ দশদিনে হওয়া স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন থেকে তিনি শেষ দশদিন ইতেকাফে বসতে লাগলেন। অত:পর তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীগণ ইতেকাফে বসেন।

রমাদ্বানে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য কিয়ামুল লাইল ও অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। তিনি দীর্ঘ সময় কিয়ামুল লাইল করতেন। রাসূল সাঃ বলেন

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

"ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের নামায"। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৮১২)

রাতের নামাযের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيمًا) [الفرقان[٦٣-٦٤ :

"রহমানের বান্দাহ তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খ ব্যক্তিরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলে, তখন তারা বলে, 'সালাম' এবং যারা রাত্রিযাপন করে তাদের পানলকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে"। (সূরা আল-ফুরকান: ৬৩-৬৪)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

كانُوا قَلِيلًا مِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ(

"রাতের কিয়দংশে তারা নিদ্রা যেত এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।" (সূরা আয-যারিয়াত: ১৭-১৮)

কদরের রাত্রিগুলোর অনুসন্ধানের ব্যাপারে ও তিনি জোর তাগিদ দিয়েছেন।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় ক্বদরের রাত্রিতে (নামাযে) দাঁড়ায়, তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮০২)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদ্বানের শেষ দশ রাতে নিজে লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতেন এবং পরিবার পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন। ইমাম মুসলিম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ في غَيْرِه

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের শেষ দশদিনে আল্লাহর ইবাদাতে এতটা পরিশ্রম করতেন যা তিনি অন্য সময় করতেন না"। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৪৫)

রামাদান মাস কুরআন নাযিলের মাস। এ মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক থেকে অধিক পরিমানে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

তার সীরাত অনুসরণ করে প্রত্যেক মু'মিনের উচিত এ মাসে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা, বুঝা এবং আমল করা।

ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ

"জিবরীল রামাদানের প্রতি রাতে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাকে নিয়ে কুরআন পাঠ করতেন"। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৪৮)

যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তার ব্যাপারে আল্লাহ এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, সে দুনিয়ায় ভ্রষ্ট হবে না এবং আখিরাতে দুর্ভাগা হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আল্লাহ বলেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (

"সুতরাং যে আমার দেয়া হিদায়াতের পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুঃখ কষ্টে পতিত হবে না।" (সূরা ত্বা-হা)

يَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبَرُ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِر(٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِر [: ((٧)

'১. ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)। ২. ওঠ, সতর্ক কর। ৩. আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। ৪. তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। ৫. (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। ৬. (কারো প্রতি) অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশে। ৭. তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) জন্য ধৈর্য্য ধর।'
(আল-মুদ্দাসির ৭৪: ১-৭)

সে সময় আরববাসীরা ধর্মের কেন্দ্রস্থল হওয়া সত্বেও বিভিন্ন ধরনের মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। তারা সঠিকভাবে হজ আদায় করতে পারত না ।তবুও তারাই ছিল কাবার তত্ত্বাবধায়ক ।সেজন্য মক্কার মানুষদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। কুরাইশদের মূর্তি পূজা ছাড়া দিনের ব্যাপারে আর কোন জ্ঞান ছিল না। আল্লাহ রাসুল সাঃ এর মাধ্যমে পথ হারা মানুষকে পথ প্রদানের উদ্দেশ্যে সুরা মুদ্দাসসিরের আয়াত সমূহ নাযিল করেন। তখন মক্কায় গোপনে দাওয়াত দেয়া ছাড়া আর কোন পরিবেশ ছিল না। যেন আরববাসীরা খুব বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তেজিত না হয়ে যায়। রাসুল সাঃ এর কাছের মানুষ, নিকট আত্মীয়, তাঁদের পরিবারের লোকজন, সবার কাছে প্রথমে তিনি দাওয়াত পেশ করেছিলেন। যারা প্রথম অবস্থাতে ইসলাম কবুল করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম ছিলেন নবী পত্নী খাদিজা তুল কুবরা বিনতে খুয়াইলিদ, তাঁর মুক্ত

ক্রীতদাস যায়দ বিন হারিসাহ বিন শুরাহবিল কালবী, তাঁর চাচাত ভাই আলী বিন আবু তালিব। সাওর গুহার সঙ্গী আবু বাকর সিদ্দীক। এনারা সকলে প্রথম দিকেই মুসলিম হয়েছিলেন।তারপর আবু বকর রাঃ ইসলাম প্রচারে বেশ তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁর চেষ্টায় উসমান, জুবাইর আব্দুর রহমান বিন আওফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং ত্বালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। ইনারাই ছিলেন প্রথম ইসলাম কবুল কারী জনগোষ্ঠী। প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে বিলাল হাবশি ও ছিলেন। এরপর ইসলাম কবুল করেন বনু হারিস বিন ফেহর গোত্রের আবু উবায়দা আমির বিন জাররাহ, আবু সালামাহ বিন আব্দুল আসাদ মাখযূমি,আরক্কাম বিন আবিল আরক্কাম,উমারের বোন ফাত্বিমাহ বিনতে খাওাব সহ আরো অনেকে।এরা সকলেই কুরাইশ কিংবা কুরাইশের শাখা গোএের ছিলেন। কুরাইশ ছাড়া অন্য গোত্র থেকে প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ কারীরা ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, মাসউদ বিন রাবীআহ,আব্দুল্লাহ বিন জাহশ আসাদী ও তার ভাই আহমাদ বিন জাহশ সহ আরো অনেকে। বিভিন্ন অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলা মিলে ইসলাম গ্রহণকারী কারীর সংখ্যা ছিল ৩৩০ জন। অনেকেই যখন ইসলামে প্রবেশ করতে লাগলেন একতাবদ্ধ হয়ে এবং ইসলামের অবস্থান টা একটু শক্তিশালী হয়ে গেল, তখন রাসূল সাঃ প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতে নিয়োজিত হলেন। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালার বাণী অবতীর্ণ হয়,

وَأَنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِين'،

আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।' (আশ-শু'আরা ২৬: ২১৪

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা সূরা শুয়ারাতে প্রথমেই মুসা আঃ এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিভাবে তিনি হিজরত করেছেন, কিভাবে বনি ইসরাইলকে নিয়ে হিজরত করেছেন, কিভাবে ফেরাউনের মত এমন ক্ষমতাধর শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে রবের নির্দেশে দাওয়াতি কাজ করেছেন। কত অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতিত হয়েও তিনি আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। কিভাবে আল্লাহ সুবহানুওয়া তা'আলা বাতিলের মধ্য থেকে হক্ককে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিভাবে আল্লাহ মূসা আঃ এবং তাঁর কওমকে সাহায্য করেছেন। এসব কিছুই করেছেন প্রকাশ্যে দাওয়াহ দেওয়ার সময়। আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা এই আয়াতগুলো নাযিল করেন

যেন, নবী সাঃ দাওয়াহ দেয়ার পরে, যখন মিথ্যাবাদীদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন এই চিএগুলোর চিত্র যেন নবীর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এছাড়া ইব্রাহিম, লুত আঃ, সামুদ সম্প্রদায়ের কথাও বলা হয়েছে। সকল নবীদের সময়ে তাদেরকে কিভাবে নির্যাতন করা হতো প্রকাশ্যে দাওয়াহ দেয়ার সময়। কিন্তু দিনশেষে আল্লাহ, আল্লাহর দ্বীনকেই নবী রাসুলদের মাধ্যমে বিজয় দান করেছেন।আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী সাঃ বনুহাসিম গোত্রের সবাইকে এক করে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করতে থাকলেন। সম্মেলনে প্রায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের শুরুতে আবু লাহাব বলেন, দেখো এরা সকলে তোমার নিকট আত্মীয়, চাচা, চাচাতো ভাই এদের সঙ্গে ভালোভাবে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করবে। আবু লাহাব আরো বললেন যদি তুমি তোমার কথার উপরে অটল থাকো তাহলে কুরাইশ রা ই তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। আমার জানা নাই যে, স্বীয় পরিবারে তোমার চেয়ে বড় সর্বনাশা আর কে হতে পারে। আবু লাহাবের এসব কথা শুনে নবী সাঃ নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং সেখানেই সম্মেলন শেষ হয়ে গেল। পরবর্তীতে নবী সাঃ নিজের গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত করে আবার একটি সম্মেলন এর ব্যবস্থা করলেন। সেখানে সবাইকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন

الحَمْدُ لِلَّهِ، أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ، وَأُوْمِنُ بِهِ، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه(

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আমি তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাঁর উপরেই নির্ভর করছি এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই উপাসনার যোগ্য নয়। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই।"

তারপর তিনি বলেন:

)إِنَّ الرَّائِدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ، وَاللهِ الَّذِي لا إلهَ إِلَّا هُوَ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ عَامَّةً، وَاللَّهِ

لتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُوْنَ، وَلَتَبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، وَلَتَحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، وَإِنَّهَا الْجَنَّةُ أَبَدًا أَوِ النَّارِ أَبَدًا (

"কল্যাণকামী পথ-প্রদর্শক স্বীয় আত্মীয়-পরিজনগণের নিকট কখনই মিথ্যা বলতে পারেন না, সেই আল্লাহর শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য নেই। বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আমি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ জানেন, তোমরা সকলেই সেভাবেই মৃত্যুর সম্মুখীন হবে, যেমনটি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো এবং সেভাবেই পুনরায় উত্থিত হবে যেমনটি তোমরা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হও। পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের সফলতা সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং পুণ্যের ফলশ্রুতি হিসেবে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির আবাস স্থল জান্নাতে ও পাপাচারের ফলশ্রুতি হিসেবে কঠিন আযাব ও দুঃখ-কষ্টের আবাসস্থল জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।"

এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল,
আল্লাহর শপথ এ হচ্ছে দুষ্টামি নষ্টামি। অন্যদের ধরার আগেই তোমরা এ হাত ধরে নাও। আবু লাহাবের মুখ থেকে একথা শোনার পর আবু তালিব বললেন আল্লাহর শপথ করে বলছি যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে আমি তার হেফাজত বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকব। যখন নবী সাঃ নিশ্চিত হলেন যে দ্বীন কায়েমের পথে আবু তালিব তাঁকে সাহায্য করবেন তখন তিনি সাফা পর্বতে আরোহন করে কুরাইশগণ কে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকলেন, ওহে বনু আবদে মানাফ, ওহে বনু আব্দুল মুত্তালিব। যখন তারা শুনতে থাকলো তখন তারা বলল কে উচ্চস্বরে চিৎকার করছে। লোকেরা বলল মুহাম্মদ সাঃ। তারপর সবাই একত্রিত হল। আবু লাহাব সেখানে উপস্থিত হলেন। তারপর নবী সাঃ বললেন, হে কুরাইশ বংশীয় গন তোমরা বলো আজ যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে পর্বতের অন্যদিকে এক প্রবল শত্রু বাহিনী তোমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠনের জন্য অপেক্ষা করছে তাহলে তোমরা আমার এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে কি? তখন লোকেরা বলল হ্যাঁ বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই। আমরা তোমাকে মিথ্যার সংস্পর্শে কখন ও আসতে দেখিনি। তারপর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে নবী সাঃ বলতে লাগলেন, যদি তাহাই হয় তবে শ্রবণ করুন আমি আপনাদেরকে পাপ ও আল্লাহদ্রোহীতার ভীষণ পরিণাম অবশ্যম্ভব কঠিন শাস্তির কথা কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি। তারপর সাধারণ, বিশেষ, সকল কে সত্যের পথে আহ্বান জানালেন এবং আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয় দেখালেন। তিনি একে একে সবাইকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন হে কুরাইশ গন, হে বনু কাব বিন লুয়াই, হে বনু কাব বিন মুররাহ, হে বনু হাশেম,

ফাতেমা বিন্তে মুহাম্মদ তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও। কারণ আমি আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের (উপকার অপকার) কোনো কিছুই করার মালিক নয়। আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না। নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। একথা শুনে যে যে যার যার মত চলে গেল আবু লাহাব, নবী সাঃ এর নিকট এসে বললেন তোর সর্বনাশ হোক। এজন্য কি তুই এখানে আমাদেরকে সমবেত করেছিস। তারপর সূরা লাহাবের আয়াত নাযিল হয়

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।

মক্কার অলিতে গলিতে এর পর প্রতিধ্বনি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আশা সতর্কবাণীর।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر: ٩٤]

"কাজেই তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে তা জোরে শোরে প্রকাশ্যে প্রচার কর, আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।" (আল-হিজর ৯৪)

এ আয়াত অবতীর্ণের পর রাসুল সাঃ প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দিতে থাকেন মক্কার অলিগলিতে।দ্বীনের দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পরলে ক্রমান্বয়ে দুই দলের মধ্যে বিভেদ বাড়তে থাকল।

রাসুল সাঃএর উপর নির্যাতন

নবী সাঃ এভাবেই প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকলেন। আরবরা যখন জানতে পারল যে, নবী সাঃ তাদের মূর্তির বিরোধিতা করছে এবং এতে তাদের মূর্খতায় প্রকাশ পাচ্ছে, তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতায় লেগে যায়। কুরাইশরা যখন দেখল আবু তালিব মুহাম্মদকে নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের হাতে সমর্পণ করছে না তখন কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলল, হে আবু তালিব আপনার ভাতিজা আমাদের দেবদেবীকে গালিগালাজ করছে, আমাদের ধর্মের নিন্দা করছে, আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে বোকামি বলছে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট বলছে। এমতা অবস্থায় আপনি তাকে হয় এসব থেকে বিরত রাখুন নতুবা তাকে শায়েস্তা করার জন্য আমাদেরকে সুযোগ দিন। আবু তালিব তাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বিদায় করলে রাসূল সাঃ তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তখন তারা রাসূল সাঃ এর তীব্র সমালোচনায় মেতে উঠল। আবার তারা আবু তালিব এর কাছে গিয়ে বলল, হে আবু তালিব আপনি আমাদের মধ্যে প্রবীণ ও মুরুব্বী আমরা আপনাকে গণ্যমান্য শ্রদ্ধেয় মনে করি। আমরা বলেছিলাম আপনার ভাতিজাকে নিষেধ করুন কিন্তু আপনি তা করলেন না আল্লাহর কসম আমরা এভাবে আর চলতে দিতে পারি না। এখন হয় আপনি তাকে নিবৃত্ত করবেন না হয় আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হব, এক পক্ষ ধ্বংস হওয়ার আগে আমরা থাকবো না। আবু তালিব রাসূল সাঃ কে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁকে বললেন ভাতিজা তোমার সম্প্রদায়ের লোকজন আমার কাছে এসে এসব কথা বলছে। তারপর বললেন, অবস্থা যখন এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তুমি নিজেকে ও আমাকে সামলে চলো। আমার উপর আমার সাধ্যের বেশি কিছু চাপিয়ে দিও না। রাসূল সাঃ ভাবলেন তাঁর চাচা মত পাল্টিয়েছেন এবং তাঁকে আর কোনো সাহায্য করতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। তাই রাসূল সাঃ বললেন চাচাজান আল্লাহর কসম করে বলছি তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় এবং তার বিনিময়ে আমাকে এ কাজ ত্যাগ করতে বলে তবুও আমি এটা ত্যাগ করবো না। আমি ততদিন পর্যন্ত এ কাজ করতে থাকবো যতদিন না আল্লাহ তার দ্বীনকে বিজয়ী করেন এবং এই কাজ করতে করতে আমি ধ্বংস হয়ে যায়। এই কথা বলার পর রাসূল সাঃ এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চলে যেতে লাগলেন। কিছুদূর গেলে আবু তালিব তাকে ডেকে বললেন, হে ভাতিজা কাছে এসো। তিনি

বললেন ঠিক আছে তুমি যা বলতে চাও, বলতে থাকো আমি কখনো কোন কারনে তোমাকে ওদের কাছে সমর্পণ করবো না। কুরাইশরা যখন দেখল রাসুল সাঃ কে আবু তালিব এ পরিস্থিতিতে একা ছেড়ে দিতে রাজি নন, তখন তারা উমারহ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা নামক এক যুবক কে আবু তালিবের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, হে আবু তালিব এ যুবকের মত শক্তিমান ও সুদর্শন যুবক আর নেই। একে আপনি পুত্র হিসেবে গ্রহণ করুন এর বুদ্ধিমত্তা ও সাহায্য সহযোগিতা দ্বারা আপনি উপকৃত হতে পারবেন। আর আপনার ঐ ভাতিজাকে আমাদের হাতে তুলে দিন। যে আপনার পূর্বপুরুষের ধর্মের বিরোধিতা করছে, আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। তাঁকে আমাদের হাতে তুলে দিন আমরা তাঁকে হত্যা করি। একজন মানুষের বিনিময়ে আপনি আরেকজন মানুষ পেয়ে যাচ্ছেন। আবু তালিব বললেন আল্লাহর কসম তোমরা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার আমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছ। আমি কি এমন প্রস্তাব মেনে নিতে পারি যে তোমরা তোমাদের সন্তান আমাকে দেবে আমি তাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করব আর আমার সন্তান তোমাদের হাতে তুলে দেবো।আর তোমরা তাকে হত্যা করবে। খোদার কসম জেনে রাখো এটা কখনো হবে না। তারপর পরিস্থিতি খারাপের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে সবাই পরস্পর পরস্সরের বিরুদ্ধে যেতে লাগল। সকল গোত্রের লোকেরা তাদের ভেতরের অল্পসংখ্যক মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর নির্যাতন শুরু করল। ইসলাম ত্যাগ করার জন্য চাপ দিতে লাগলো। আবু তালেব রাসুল সাঃ এর উপর এই অত্যাচার হওয়া থেকে বিরত রাখলেন। হজের মৌসুমে লোকজন যখন আগমন করলো তখন তারা পথ আগলে বসে থাকতো এবং মানুষকে সাবধান করতে যেন, মুহাম্মদের নিকট না যায়। লোকেরা বললো আমরা বলবো মুহাম্মাদ গণক। ওয়ালিদ বলল অনেক গণকের কথাবার্তা আমি দেখেছি। গনক এমন কথাবার্তা বলেনা। তারপর সবাই বলল তাহলে বলবো মুহাম্মদ পাগল, ওয়ালিদ বলল সে পাগল ও নয়, আমরা অনেক পাগল দেখেছি। আর পাগলামি কেমন তা জানি, পাগলের কথাবার্তা এমন থাকে না। লোকেরা বলল তাহলে আমরা বলব সে একজন কবি, ওয়ালিদ বলল সে কবি নয়। তাহলে আমরা বলব সে যাদুকর।ওয়ালিদ বলল এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদের কথা শুনতে বেশ মিষ্টি , তার গোড়া অত্যন্ত শক্ত, শাখা প্রশাখা বড়। তোমরা যে কথাই বলবে তা মিথ্যা হবে। তবে সবচেয়ে উপযুক্ত কথা হবে তাকে জাদুকর বলা। হজের মৌসুমে যখন সমগ্র আরবের সবাই ছড়িয়ে পড়লো তখন সবার মুখে মুখে শুধু রাসুল সাঃ এর কথায় ছড়িয়ে পড়লো। সবাই কবি, জাদুকর, মিথ্যাবাদী

জ্যোতিষী ইত্যাদি অপবাদ দিতে লাগলো এবং রাসূল সাঃ কে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে লাগলো। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বলেন, একদিন যখন কুরাইশ সরদারগণ হাজরে আসওয়াদের নিকট সমবেত হয়েছে তখন আমি সেখানে উপস্থিত হলাম তারা রাসূল সাঃ এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলল, এই লোকটার ব্যাপারে আমরা যতটা সহিষ্ণুতা দেখেছি তা নজির বিহীন। সে আমাদেরকে গালাগালি করেছে। রাসুল সাঃ সেখানে আবির্ভূত হয়ে এগিয়ে গেলেন তারপর তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। অতঃপর সমবেত লোকদের পাশে গিয়ে তাওয়াফ করলেন। তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করল। রাসূল সাঃ এর মুখে আমি সে মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম। দ্বিতীয়বার যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন তখন তারা বিরূপ মন্তব্য করল, আমি রাসূল সাঃ এর চেহারায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখলাম। তৃতীয়বার তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তারা মন্তব্য করলে তিনি সেখান থেমে বললেন, হে কুরাইশগন শোনো যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের সর্বনাশ বয়ে এনেছি যদি তোমার ঈমান না আনো। পরেরদিন রাসুল সাঃ আবার সেই স্থানে সমবেত হলেন। আমিও সেখানে ছিলাম। তখন তারা বলতে লাগলো দেখলে তো মুহাম্মাদের ধৃষ্টতা, তোমরা যা একেবারে পছন্দ করো না তা সে তোমাদের মুখের উপর বলে দিল আর তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে ঠিক সেই মুহূর্তেই রাসূল আবির্ভূত হলেন। তখন সবাই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবাই তাঁকে ঘেরাও করে বলতে থাকলো তুমি তো আমাদের ধর্ম, দেবদেবীর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকো। রাসূল সাঃ বললেন হ্যাঁ আমিই বলে থাকি। আমি দেখলাম তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি রাসূলকে তার গলার উপরের চাদরে দুপাশ ধরে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। সে মুহূর্তে হযরত আবু বক্কর রাঃ এগিয়ে বাধা দিলেন, তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন একটি লোক আল্লাহকে নিজের রব বলে ঘোষণা করেছে, এ কারণে কি তোমরা তাকে হত্যা করে ফেলবে? এরপর সবাই সেখান থেকে চলে গেল। আমি রাসূলে সাঃ এর উপর কুরাইশদের মত এমন আক্রমণ করতে আর কখনো কাউকে দেখিনি।"এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

কাফিররা যখন আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে আপনাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা বের করে দেবে তখন তারা যেমন আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল,

আল্লাহও তেমনি পরিকল্পনা করেছিলেন। আর পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ।" (সূরা আনফাল, ৮: ৩০)

অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত লোকেদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

দামাদ আল আযদি

দামাদ আল আযাদি ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার বাসিন্দা। একবার মক্কায় এসে তিনি একটি গুঞ্জন শুনতে পেলেন। লোকেরা বলাবলি করছিল এক লোককে জিনে ধরেছে। তারা আসলে রাসুল সাঃ এর কথায় বলছিল। তিনি আন্তরিকভাবে সাহায্যের নিয়তে রাসুল সাঃ এর কাছে গিয়ে বললেন, শুনেছি আপনাকে জিনে ধরেছে, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আপনি যদি চান তো আমি জিন তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারি। যেকোনো সুস্থ মানুষের জন্য এমন কথা শুনা অপমানজনক। কিন্তু রাসূল সাঃ রেগেও গেলেন না তাকে তাড়িয়ে ও দিলেন না। প্রচন্ড ধৈর্য্যশীল ও বিচক্ষণতার সাথে খুতবার দোয়া পড়ে তিনি বললেন,

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁরই সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ তায়ালা যাকে পথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইবাদতের যোগ্য ইলাহ নেই। আল্লাহ এক তাঁর কোন শরিক নেই।

আরবিতে এই দোয়াটি শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং বললেন মুহাম্মাদ (সাঃ) আপনি কি আরো একবার বলবেন। রাসূল সাঃ পুনরায় দোয়াটি পড়ে শোনালেন। দামাদ বললেন এমন কথা আমি আগে আর কোনদিন শুনিনি। কি চমৎকার কথা যেন সাগরের গভীরে যেয়ে আঘাত হানবে। তখন রাসূল সাঃ তাকে বায়আত হওয়ার আমন্ত্রণ জানালে তিনি এক মুহূর্ত দেরি না করে বায়আত হলেন।

আবু যার:গিফারের বাতিঘর

ইসলামের ইতিহাসের এক অনন্য নাম আবুযার গিফারি। ইমাম আহমেদ থেকে বর্ণিত আবুযারের ভাষ্য অনুযায়ী, আমরা ছেড়ে চলে এলাম আমাদের গিফার শহর। ছোট থেকে যেখানে বড় হয়েছি শেষ পর্যন্ত সে গিফার ছাড়তে বাধ্য হলাম। মা আর ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম নতুন গন্তব্যের আশায়। গিফারের লোকেরা একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছিল। পবিত্র মাসেও তাদের যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। আশহুরুল হারামের এই অপমান আর সহ্য করা যায় না। আশহুরুল হারাম হলো সেই চার মাস যেগুলোকে

আরবের লোকেরা পবিত্র মাস বলে মনে করত। এ সময় তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতো এবং তাদের ঐতিহ্য ছিল তারা কোন প্রকার হত্যা বা খুনাখুনি করবে না কারোর মর্যাদা ক্ষুন্ন করবে না এই চার মাসে। তবে গিফারের লোকেরা ছিল ব্যতিক্রম। লুটপাট, হানাহানি করায় ছিল তাদের পেশা। তাদের অপকর্ম পুরো আরব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। গিফার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এই জীবন পছন্দ করতেন না। তাই একসময় গিফার ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথমে দেখা করলেন তাঁর চাচার সাথে। তাঁর চাচা অন্য গোত্রের সদস্য। আবুযারের ভাষায় চাচা আমাদের প্রতি খুবই দয়ালু এবং যত্নবান ছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রতি চাচার বিশেষ যত্ন মেহমানদারী বাঁকি আত্মীয় স্বজনদের সহ্য হচ্ছিল না। তারা হিংসা করত। একদিন সুযোগ বুঝে তারা আবু যারের চাচার কানে বিষ ঢেলে দিল। বলল আপনি যখন এখানে থাকেন না সেই সুযোগে আবুযার ও তার ভাই উনাইস আপনার স্ত্রীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে। চাচা আগে পিছে কিছু বিবেচনা না করে সোজা আবুযার ও তার ভাই উনাইস এর কাছে হাজির হলো। তাদেরকে এসব কথা শোনালেন, আবুযার চাচার মুখে এসব কথা শুনে খুবই মর্মাহত হলেন। বললেন চাচা আপনার দীর্ঘদিনের যত্ন,উত্তম আচরণ সবই আজ বরবাদ হয়ে গেল। আপনি কিভাবে পারলেন আমাদের বিরুদ্ধে এমন একটা অভিযোগ তুলতে। আপনার এত দয়ার আর কোন মূল্য থাকলো না। এই বলে তারা সেখান থেকে চলে গেল। পরে আবুযারের পরিবার মক্কার কাছাকাছি একটি অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেয়। আবু যার বর্ণনা করেন আমার ভাই উনাইস ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে মক্কা যায়। সেখানে তার সাথে এক লোকের দেখা হয় সে নিজেকে নবী দাবি করছিল। উনাইস ফিরে এসে বলল আমার সাথে আজ এক লোকের সাক্ষাৎ হয়েছে তিনি এক নতুন দিন প্রচার করছেন। তিনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেন আমি বললাম আরে আমি তো ইতিমধ্যে সকল প্রকার মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা বাদ দিয়েছি তিন বছর যাবত কেবল এক আল্লাহতাআলার ইবাদত করছি। আবু যারের ফিতরাহ ছিল বিশুদ্ধ ও জন্মগত। স্বভাব ও প্রকৃতি তাকে বলে দিত কোনটা সঠিক আর ভুল। আবুযরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তুমি কিভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে। তিনি বললেন আল্লাহ আমাকে যে দিকে ফিরে দোয়া করার নির্দেশ দিতেন আমি সেদিকেই ফিরে দোয়া করতাম, আল্লাহ আমাকে যেভাবে দোয়া করতে বলতেন আমি সেভাবে দোয়া করতাম। আর আমি রাত হওয়ার দোয়া করে যেতাম যতক্ষণ না ঘুম এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আর এরপর আমি জেগে উঠি। আবুযর তার ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলেন সেই মানুষটি

কি শেখান।উত্তরে উনাইস ইসলামের কথাগুলো বললেন।নবীজি সাঃ এর কাছ থেকে সেগুলো তিনি শিখেছিলেন।আবুযর তাকে জিজ্ঞেস করলো লোকে তাঁর সম্পর্কে কি বলে, সে বলল তাকে বলে জাদুকর, গণক, মিথ্যাবাদী। তারপর তিনি নিজেই রাসুল সাঃ এর সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলেন, লোকেরা যা বলে তা সত্য না হতে পারে ভেবে। তাঁর বর্ণনা মতে, আমি মক্কায় যাকে সামনে পেলাম তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি আমাকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে যেতে পারবে। কথা নেই বার্তা নেই সেই লোক সজরে চিৎকার করে কুরাইশদের জড়ো করে ফেলল। কুরাইশরা এসে আমার উপর অতর্কিত হামলা শুরু করল। পাথর নূরী, যে যা কিছু পারছিল তাই দিয়ে। একসময় আমি জ্ঞান হারাই। জ্ঞান ফিরলে আমার নুসুব আহমারের মতো অবস্থা। নুসুব আহমার হলো সেই পাথর, যার উপর কুরাইশরা তাদের দেবদেবীর নামে পশু বলে দিত। পরে পাথরটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে যেত। মার খাওয়ার পর আবু যরের শরীরের অবস্থা সেরকম হয়ে গেছিল। আমি যমযম কূপের কাছে গিয়ে সেখান থেকে পানি খেলাম। যমযমের পানি দিয়ে গায়ের রক্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলাম। এরপর আমি কাবার পাশে গেলাম। ইমাম আহমেদ বর্ণনা করেন আবুযর সেখানে ৩০ দিন অবস্থান করেন কারণ তিনি জানতেন না নবী সাঃ এর দেখা কোথায় পাওয়া যায়।একেবারে ৩০ দিন খাবার ছারা বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল। কিন্তু যমযমের পানির দরুন এটা সম্ভব হয়েছিল। তিনি বলেন আমি আরো এত সুসাস্থের অধিকারী হয়ে গিয়েছিলাম যে আমার পেটে ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন একদিন দেখতে পেলাম দুজন মহিলা কাবার চারপাশে তাওয়াফ করছে। প্রত্যেক চক্করে চক্করে তারা ইসাফ আর নায়লা পাথরকে স্পর্শ করছিল। ইসাফ আর নায়লা ছিল দুইটি মূর্তি। আবুযার মূর্তি পূজা বিরোধী ছিলেন। তিনি কাবার চারপাশে এমন মূর্তিপূজা দেখে আর সহ্য করতে পারলেন না। মহিলা দুটোর দিকে খুবই বাজে ভাষায় মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন তোমরা পাথর দুটোর একটিকে আরেকটির সাথে সঙ্গম করিয়ে দিলেই তো পারো। প্রথমে তারা কথাই বোঝেনি কিংবা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তাদের দেব দেবীর নামে কেউ এমন অশ্লীল মন্তব্য করতে পারে।আবুযর তখন তার চেয়েও আরো বাজে মন্তব্য করলেন। এবার তারা নিঃসন্দেহে বুঝলো যে ওই লোকটি তাদের মূর্তি সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করছে। তারা চিৎকার করতে করতে দৌড়ে মক্কার রাস্তায় চলে গেল। ছুটতে ছুটতে হাজির হলো মুহাম্মদ সাঃ ও আবু বকরের সামনে। মুহাম্মাদ সাঃ তাদের জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে তোমাদের। ওই যে ওখানে

একটা মুরতাদ। কি করছে সে। সে কথা মুখে আনার মত নয়। রাসূল সাঃ সে লোকের সাথে দেখা করতে চললেন। সেখানে গিয়ে আবুযরকে পেলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কোথা থেকে এসেছো। আবুযর বললেন আমি এসেছি গিফার থেকে। রাসুল সাঃ মমতার সাথে তাঁর হাত আবুযরের কপালে রাখলেন। রাসূল সাঃ জানতেন গিফারে সত্যের অনুসন্ধানে কেউ নেই। সত্যের অনুসন্ধান নিয়ে কেউ মক্কায় চলে এলো আর মক্কার কুরাইশরা ধর্মে কর্মে এগিয়ে থেকেও দ্বিনের ব্যাপারে এগিয়ে এলো না। রাসূল সাঃ তাই তাঁর হাত পরম মমতায় আবু যরের কপালে রাখলেন। আবু যার কে উপদেশ দিলেন তোমার ঈমানের কথা কারো কাছে প্রকাশ করো না।
কিন্তু প্রবল উৎসাহে পরদিনই আবুযর কুরাইশদের সামনে এসে চিৎকার করে আসআদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলে বসলেন। কুরাইশরা এটা শুনে তাঁকে ঘিরে ধরে মারতে আরম্ভ করলো, আর একটু হলে তিনি সেখানেই মারা যেতেন। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এসে সে যাত্রায় তিনি রক্ষা পেলেন। আবু যার গিফার গোত্রের শুনে সবাই তাঁকে রেখে পালিয়ে গেল। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব বললেন এই লোক গিফার থেকে এসেছে তোমাদের হাতে মারা পড়লে কি হবে। তোমাদের কোন লোক আর সিরিয়া পৌঁছাতে পারবে না ব্যাবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে।পরদিন আবুযর আবার একই কাজ করলেন। কুরাইশরা আবার তাঁকে মারধর করলেন। এবারও আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সহায়তায় কোনোমতে বেঁচে গেলেন।তিনি প্রায় প্রতিদিন ই একই কাজ করতেন।রাসুল সাঃ এরপর আবুযরের কাছে গিয়ে বললেন। তুমি তোমার লোকদের কাছে ফিরে যাও। আর তাদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দাও। যখন শুনবে আমি বিজয়ী হয়েছি তখন আমার সাথে দেখা করতে আসবে। তারপর আবু যর ফিরে গিয়ে ইসলামের বানী পৌঁছে দিতে লাগলেন।তাঁর হাত ধরে সেই গোত্রের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান হয়ে ওঠে। তিনি বলেন আমরা ঠিক করলাম রাসুল সাঃ এর সাথে আমরা দেখা করতে যাবো। তখন গোত্রের বাঁকি সদস্যরা ও বলে উঠল রাসুল সাঃ মদিনা আসলে আমরা তাঁর সাথে দেখা করব। এভাবে পুরো গিফার গোত্রই মুসলিম হয়ে যায়। অতঃপর একদিন মদিনায় অবস্থানকালে নবীজি সাঃ ধুলোর মত মেঘ দেখতে পান। দেখে মনে হচ্ছিল সৈন্যদল আক্রমণ করতে আসছে। সাহাবীরা অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু রাসুল সাঃ বললেন না সম্ভবত আবুযর আসছে। রাসূল সাঃ এর ধারনা সত্যি হলো। তিনি তাঁর পুরো গোত্রকে নবীজি সাঃ এর র কাছে নিয়ে এসে

বায়আত হলেন। আবুযরের ঘটনা থেকে পাওয়া অন্যতম এক শিক্ষা হলো যে ব্যক্তি সরল পথ খোঁজে আল্লাহ তাঁকে পথ দেখান।এজন্য ই আবু যার দূর দুরান্ত থেকে এসে হলেও দ্বীনের পথের সন্ধান পেয়েছিলেন,কিন্তু মক্কার মুশরিকরা এত কাছে অবস্থান করেও সঠিক পথের দেখা পায় নি।

প্রথম হিজরত:আবিসিনিয়া

আবিসিনিয়া তে মুসলমানেরা সর্বপ্রথম দুই বার হিজরত করেছিলেন। প্রথমবার ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার একটি ছোট দল। আর দ্বিতীয়বার ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮-১৯ জন মহিলার একটি বড় সড় দল। প্রথম দলটি আবিসিনিয়ায় পৌঁছে শুনতে পায়, মক্কার কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গিয়েছে। প্রকৃত ঘটনা ছিল রাসূল সাঃ সূরা আন নাজমের শেষের আয়াতগুলো কুরাইশের লোকদের পড়ে শোনালে তারা বিমোহিত হয়ে সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। সেই সময় নবী সাঃ এর সাথে কাফেররাও সিজদা দেয়। ফলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কুরাইশরা সবাই মুসলিম হয়ে গিয়েছে। যার দরুন হাবসা থেকে মুসলমানেরা মক্কায় ফিরে আসে। এসে বুঝতে পারে এই খবর ছিল মিথ্যা। সাহাবীদের কষ্ট আর নির্যাতন দেখে রাসূল সাঃ বললেন তোমরা হাবাসাতে চলে গেলেই পারো। কেননা সেখানে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা আছেন যিনি কারো সাথে জুলুম করেন না তিনি হলেন আন - নাজ্জাশী। যিনি খৃস্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন। সবার প্রথমে ওসমান ইবনে আফফান তাঁর স্ত্রী নবী কন্যা উম্মে কুলসুমকে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন। তারা চলে গেলে দ্বিতীয় দলটিও মক্কা ত্যাগ করে। কিন্তু মক্কার লোকেরা এত সহজে তাদেরকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। আবিসিনিয়ায় হিজরত করা মুসলিমদের জন্য কঠিন কোন জায়গা ছিল না। কিন্তু কুরাইশরা তাদেরকে একা ছাড়লো না তারা বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র করতেই লাগলো। আমর ইবনে আস ছিলেন একজন দক্ষ কূটনীতিবিদ। কুরাইশদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গের সাথে তার পরিচয় ছিল,কুটকৌশলে ও ছিলেন তিনি অত্যন্ত পারদর্শী। আমর ইবনে আস নাজ্জাশীর দরবার এ গিয়ে কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে কিছু উপহার দিয়ে নিজের প্রস্তাবনার কথা বলবে এমনটাই পরামর্শ করে গিয়েছিল মক্কার লোকেদের সাথে। মুসলমানদের নাজ্জাশীর সাথে দেখা হওয়ার পূর্বে সে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে সোজা বাংলায় ঘুষ দিয়ে মুসলমানদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবে,তার মনে ভয় ছিল মুসলমান দের সাথে দেখা হলে নাজ্জাশি মুসলমানদের কথার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়তে পারে। নাজ্জাশী ছিলেন অত্যন্ত ন্যায় পরায়ন নেতা তিনি বললেন মুসলমানদের সাথে দেখা না করে আমি অন্য কারোর হাতে তাদেরকে তুলে দেব না। মূলত রাসূল সাঃ এ কারণে আবিসিনিয়ায় মুসলমানদেরকে হিজরত করার কথা বলেছিলেন। নাজ্জাশি মুসলিমদেরকে ডেকে পাঠান। মুসলিমদের শুরার

মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে তাদের মুখপাএ হিসেবে নাজ্জাশির সাথে কথা বলবেন জাফর ইবনে আবু তালিব। জাফর ইবনে আবু তালিব অত্যন্ত সুকৌশলে তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন। তিনি অল্প কথায় ইসলামের পুরো সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। জাফর ইসলামের এমন সব সুন্দর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান এবং বুঝতে পারেন ইসলাম কোন খারাপ কাজে নির্দেশ দেয় না। নির্যাতনের কথা শুনে নাজ্জাশীর মন নরম হয়। তার মনে পড়ে যায় ঈসা আঃ ও তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের কথা। তিনি নিজে ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। জাফরের চমৎকার উপস্থাপন শেষে তিনি প্রশ্ন করলেন মুহাম্মদ তোমাদের কাছে যা এনেছেন, তার কিছু কি তোমরা এনেছো। তিনি কুরআনের আয়াত শুনতে চাচ্ছিলেন। জাফর ইবনে আবি তালিব বিচক্ষণতার সাথে সূরা মারইয়াম থেকে পড়তে শুরু করলেন। তিলাওয়াত করলেন প্রথম ২৮টি আয়াত।নাজ্জাশি জাফরের তিলাওয়াত শুনে কাঁদতে লাগলেন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজে গেল। তাঁর সভার প্রত্যেক সদস্য রা মধুময় তিলাওয়াত শুনে এমন কান্না করলেন যে সবার সামনে রাখা বাইবেল গুলো ভিজে গেল। নাজ্জাশী তখন কুরাইশদের প্রস্তাবে, মুসলিমদের হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানালেন। পরদিন আবার আমর ইবনে আস বলতে লাগলেন তারা ঈসা আঃ কে একজন সাধারন দাস হিসেবে মনে করেন,আল্লাহর পুএ হিসেবে স্বীকার করেনা।নাজ্জাশি আবারো মুসলমানদের কে ডাকলে মুসলমানদের মুখপাএ হিসেবে জাফর বিন আবু তালিব এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ঈসা আঃ সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কি। মুসলমানরা তাদের সিদ্ধান্তে অটল। তারা বলল তিনি আল্লাহর দাস, আল্লাহর নবী, জন্ম নিয়েছিলেন পবিত্র ও কুমারী নারী মারইয়ামের গর্ভে। তখন নাজ্জাশি বললেন তাঁর সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য আর আমার বক্তব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানরা এতে অসন্তুষ্ট হলো কিভাবে মুসলমানরা তাকে আল্লাহর দাস মনে করে এটা তারা মানতে পারল না। এ কথা শুনে নাজজাশি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন তোমরা যা কিছু বলতে পারো আমি এই মানুষগুলোকে আমার রাজ্যে স্বাধীন ঘোষণা করলাম। যাবার সময় আমর ইবনে আস হুমকি দিয়ে গেল যেভাবে হোক তারা মুসলিমদের মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। মক্কার প্রতিনিধিরা আবিসিনিয়ায় এলে নাজ্জাশি প্রথমে তাদের জিজ্ঞেস করেন তোমরা আমার জন্য কি এনেছ। আমর ইবনে আস বলেছিলেন আমি আপনার জন্য চামড়ার তৈরি কিছু জিনিস এনেছি। চামড়ার জিনিস তাঁর খুব পছন্দের ছিল। উম্মে সালামা বলেন সেদিন আমর ইবন আস ও তার সঙ্গীকে অপমানিত হতে হলো কেন না, নাজ্জাশী

তাদেরকে বের করে দেয়। এমনকি তাদের উপহারগুলো ও ফেরত দেয়। কারণ আমর ইবন আসএর সাথে নাজ্জাশির বন্ধুত্ব থাকলেও তিনি আদর্শের প্রশ্নে কখনো বন্ধুত্বকে প্রশ্রয় দেয় নি। বরংচ সত্যের পক্ষেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মক্কার সাহসী সাহাবীরা

উসমান ইবন মাযউন

উসমান ইবন মাযউন ছিলেন মুহাজির। তিনি হিজরতের পর আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসতে চান। তিনি মক্কায় ফিরতে চায়লেও নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করতে পারছিলেন না। ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা তাঁকে নিরাপত্তা দান করলেন। কিন্তু মক্কায় ফিরে এসে যখন দেখলেন মুসলমানেরা নিপীড়ন, নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তিনি ভাবতে লাগলেন যে নির্যাতিত হওয়ার দরুন সবার গুনাহ মাফ হয়ে যাচ্ছে, শুধু তিনিই কিছু করতে পারছেন না। তাই তিনি ওয়ালীদের কাছে গিয়ে বললেন যে তার নিরাপত্তার কোন দরকার নেই তিনি সেটা ফিরিয়ে দিতে এসেছেন। ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা বললেন তুমি কেন এটা করছো? আমি শুধু আল্লাহর নিরাপত্তা চাই, তোমার নিরাপত্তা চাই না। ঠিক আছে যেহেতু আমি প্রকাশ্যে তোমাকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছি সেহেতু এ নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা ও প্রকাশ্যে দিতে হবে। তারা কাবা ঘরে গেলে ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা বলল ওসমান ইবনে মাযউন আমার নিরাপত্তা আর চায়না। সে বলেছে আমি কেবল আল্লাহর নিরাপত্তা চাই। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল উসমান ইবনে মাউযুন একটি জনসমাবেশে প্রবেশ করেছেন। সেখানে আরবের বিখ্যাত কবি লাবিদ একটি কবিতা আবৃত্তি করছিল,

আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই অসার। উসমান ইবনে মাযউন তার সাথে তাল মিলিয়ে বলল ঠিক ঠিক। সেখানে অনেক লোক জমা হয়েছিল। সে আবার বলল, আর সব সুখ ম্লান হয়ে যাবে। তার কবিতার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল তুমি ভুল বলছো। জান্নাতের সুখ কখনোই ম্লান হবে না। কবি লাবিদ ধাক্কা খেলো। সে তার কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। কুরাইশদের মধ্যে কে হতে পারে যে তার ভুল ধরিয়ে দিবে। তিনি বললেন কে সেই লোক তোমাদেরকে এভাবে হেও করার সাহস কোথা থেকে পায়। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলল সে একজন মাথামোটা, মুহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করে। তার কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না। কিন্তু উসমান ইবনে মাযউন ছেড়ে কথা বলার পাত্র নন, তিনি জবাব দিয়ে বসলেন। তখন তাদের মধ্যে হাতাহাতি, মারামারি শুরু হয়ে গেল। এক পর্যায়ে কুরাইশরা উসমানের চোখে ঘুষি মারল। ওয়ালিদ এই ঘটনা দেখে

বলল কি দরকার ছিল তোমার, আমি তো তোমাকে আমার নিরাপত্তার মধ্যে রেখেছিলাম। ওসমান ইবনে মাযউন বললো না বিষয়টা তেমন না আল্লাহ তো সব চেয়ে শক্তিশালি।আমি তো চাই আমার ভালো চোখটিও যদি আঘাতপ্রাপ্ত চোখের মতো হতো। সত্যি বলতে আমি এমন একজনের নিরাপত্তায় আছি যিনি তোমার চেয়ে শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান তুমি কি আমার নিরাপত্তায় ফিরে আসতে চাও না। আমার প্রয়োজন নেই একজন কাফের বা মুশরিক কিছু হারালে সেটা চিরতরে হারিয়ে যায় কিন্তু মুসলিমের জন্য তো যে কোন কিছুই হারানো সুসংবাদ। মার খেয়ে ফোলা চোখ নিয়ে ও কিছু গুনাহ মাফ হলে এতেই প্রকৃত মুমিনের সন্তুষ্টি। এটাই ছিল তখনকার প্রকৃত মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি।

আবু বকর

আবু বকর আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন নি। তাই তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। পরে তিনি রাসুল সাঃ এর কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলে রাসূল তাঁকে অনুমতি দিলেন। আবু বকর মক্কা ছেড়ে ইয়েমেন গেলেন। সেখানে তিনি সায়্যিদ আল হাবিশ গোত্রের কাছে যান।আল হাবিশ ছিল মক্কার নিকটবর্তী একটি গোত্র। আবু বকর সেখানে গিয়ে ইবনে দুগায়নার সাথে দেখা করলেন। ইবনে দুগায়না তাঁকে বলল আবু বকর তুমি কোথায় যাচ্ছ। আমার স্বজাতির লোকেরা আমাকে কষ্ট দিয়েছে খুব খারাপ ভাবে আঘাত করেছে এ কারণে আমি চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। তোমার মত একজন মানুষ তো তার স্বজাতির সম্পদ। এভাবে তুমি চলে আসতে পারো না। তুমি দুঃখীদের সাহায্য কর, তুমি গরিবদের প্রতি সহানুভূতিশীল আর তারা তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। তুমি মক্কায় ফিরে যাও আমি তোমাকে নিরাপত্তা দেব। তিনি আবু বকরকে সাথে করে মক্কায় আসেন এবং মক্কার সমস্ত মানুষদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন আবু বকর আমার নিরাপত্তার মধ্যে আছেন। আমি বুঝিনা এরকম একজন মানুষকে তোমরা কিভাবে দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও। তোমরা কিভাবে তার মত একটা মানুষকে তাড়িয়ে দিতে পারলে। আজকে থেকে তিনি এখানে থাকবেন এবং আমার নিরাপত্তার অধীনে থাকবেন।লোকেরা বলল সে তোমার নিরাপত্তায় থাকুক তাতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই কিন্তু সে প্রকাশ্যে ইবাদত না করুক। তারপর ইবনে দুগায়না আবু বকরের কাছে গিয়ে বলল তোমার সজাতির লোকেরা চায় না তুমি তাদেরকে কষ্ট দাও।

তুমি প্রকাশ্যে সালাত আদায় করো না। আয়শা রাঃ বলেন আমার বাবা খুবই নরম মনের একজন মানুষ। কুরআন তিলাওয়াত করার সময় তিনি খুব কাঁদতেন। নারী-পুরুষ সবাইকে আবু বকরের খুশু আকৃষ্ট করতো। এটা দেখে কুরাইশরা মূলত রেগে যায়। আবু বকরের সলাত দেখে, না অন্য সবাই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় এই ভয়ে।ইবনে দুগায়না আবু বকরকে প্রকাশ্যে ইবাদত করতে মানা করেন। আবু বকর রাজি হন। কিছুদিন পর আবু বকর তার বাড়িতে গোপনে ইবাদত করেন। তারপর তিনি বাড়ির উঠানে একটা মুসল্লা বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। তারপর বাড়ির ভেতরে ইবাদত করলেও সবাই তাকে দেখতে পেত।তারপরে আবার সে আগের সমস্যাটাই ফিরে এলো। কুরাইশরা রেগেমেগে আবার দুগানার কাছে গেল। বলল আমরা তোমাকে বলেছি আমরা চায়না সে প্রকাশ্যে ইবাদত করুক। সে তো সেটাই করছে। ইবনে দুগায়না আবু বকরের কাছে গিয়ে জানতে চায়লে আবু বকর বললেন থাক আমি আপনার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার এর প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহর দেওয়া নিরাপত্তায় থাকবো। এই বলে তিনি তাঁর নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

হামযা ইবন আব্দুল মুত্তালিব

তিনি একজন শিকারী ছিলেন। প্রায়ই মরুভূমিতে শিকারের খোঁজে বের হয়ে পড়তেন। অভিযান শেষে সেটার রোমহর্ষক কাহিনী সবাইকে শোনাতেন। একদিন তিনি শিকারের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। সেই সুযোগে আবু জাহেল রাসূল সাঃ এর কাছে গিয়ে তাঁকে অভিশাপ দিতে লাগলো। রাসূল সাঃ কিছু বললেন না। সাধারণত মূর্খদের জবাব তিনি দিতেন না।মানুষ চারিত্রিক দোষ এটি উদ্ধারে অনেকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যখন কেউ ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করতে থাকে। সব কথায় সারা দিতে গেলে সেটা ব্যক্তিগত রেষারেষি তে ও পরিণত হয়। সেটা দাওয়াহ এর মধ্যে আর থাকে না। এগুলোকে পাশ কাটিয়ে দাওয়াহ দিতে হয়। আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেন

তাদের কথাবার্তায় আপনার যে দুঃখ, কষ্ট হয় তা আমি খুব ভালোভাবে জানি। কিন্তু তারা তো নিশ্চয়ই আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না বরং এই জালিমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।

আবু জাহেলের আচরণ সেদিন সীমা ছাড়িয়ে যায়। হামজা তখন মাত্র শিকার থেকে ফিরছিলেন দাসির মুখে শুনলেন তাঁর ভাতিজাকে আবু জাহেল অপমান করেছে এবং ইসলাম নিয়েও বাজে কথা বলছে। তার মন খারাপ হল। হামজা কাফির ছিলেন। তবে রাসুল সাঃ তাঁর আত্মীয়তায় ভাতিজা। তিনি রাসূলের অপমানকে নিজের অপমান হিসেবে নিলেন। আবুজেহেল সবাইকে নিয়ে কাবার সামনে বসে ছিল। হামজার হাতে তখন শিকারের সরঞ্জাম থাকা অবস্থায় আবু জেহেলকে দেখা মাত্রই ধনুক দিয়ে প্রচন্ড জোরে আঘাত করে বললেন। তোমার কত বড় সাহস তুমি আমার ভাতিজাকে আঘাত করো। শুনে রাখ আমি মুহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করছি। সাহস থাকলে আমাকে মারো।আবু জেহেলের মাথা থেকে রক্ত পড়তে লাগল,। তা দেখে দুই গোত্রের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। সেটা দেখে আবু জেহেল দু পক্ষের মধ্যে মধ্যস্হতা করে বলল, যে আমি তার ভাতিজাকে গালিগালাজ করেছি। তাকে ছেড়ে দাও। হামজা তখনো ইসলামের উপর সত্যিকারের ঈমান আনেননি। আবু জেহেলের উপর রাগের বশে সে কথাগুলো বলেছিল। পরে যখন তার হুশ হল, তখন সে ভাবলো এটা আমি কি করলাম। তিনি পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলেন। তিনি ভাবতে থাকলেন তিনি কাফির থাকবেন নাকি মুসলিম হবেন। যদি মুখের কথা ফিরিয়ে নেন তাহলে তো সেটাও আত্মসম্মানের ব্যাপার।অপর দিকে এ কথার উপর স্থির থাকাটাও কঠিন। তিনি সারারাত আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন,

বললেন হে আল্লাহ আমাকে সত্য পথ দেখান আমাকে বলে দিন আমি সত্যের উপর আছি কিনা। কুরাইশরা মুশরিক হলেও তারা আল্লাহর ইবাদত করত। দোয়া করলে আল্লাহর কাছে করত। কিন্তু তারা ভাবতো যে মূর্তিগুলো হচ্ছে দোয়া করার মাধ্যম। মূর্তিগুলোই তাদের দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয়। সকালে হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব বলেন, সকালে উঠে অনুভব করলাম আমার অন্তর ইসলামের প্রতি ভালবাসায় ভরে গেছে তাই আমি রাসূলের কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম আমি একজন মুসলিম। প্রিয় চাচাকে পাশে পাওয়া ছিল রাসুলের জীবনের সবচেয়ে অসাধারণ মুহূর্ত। আবু জেহেল নবীকে কষ্ট দিতে চেয়েছিল কিন্তু রবের পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। তিনি এর মাধ্যমেই হামজা রাঃ কে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসেন।

উমার ইবন খাত্তাব

উমার ছিলেন ইসলামের ঘোরতর শত্রু এবং কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী। তিনি অত্যন্ত পাশবিকভাবে মুসলিমদের নির্যাতন করতেন।একদিন আমর ইবন রাবিয়ার স্ত্রী লাইলার সাথে উমারের দেখা হয়। উমার বললেন কোথায় চললে উম্মে আব্দুল্লাহ।

তোমরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছো তাই আমার রবের ইবাদত করার জন্য অন্য দেশে চলে যাচ্ছি।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক তোমার ভ্রমণ নিরাপদ হোক।

উম্মু আব্দুল্লাহ খুব অবাক হলেন উমার তো এমন সহানুভূতি নিয়ে মুসলিমদের সাথে কথা বলার পাত্র নন। ঘরে ফিরলে তার স্বামীকে তিনি ঘটনাটি বললেন তার স্বামী হাসতে হাসতে বলল তুমি আশা করছ উমার মুসলিম হবে। উমারের বাবার একটি গাধা আছে সেই গাধাটি মুসলিম হলেও হতে পারে কিন্তু উমার মুসলিম হবে না। জাহেলিয়াতের সময় উমার কেমন ছিলেন সে বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন

আমি মদ খেতে ভালোবাসতাম। আমার কিছু মদ্যপানের সঙ্গী ছিল। তাদের সাথে প্রতিরাতে দেখা করতাম। এক সন্ধ্যায় বের হলাম মদশালায় গিয়ে দেখি কেউ নেই। তখন অনেক রাত হয়েছে, ভাবলাম মদের দোকানে যায়, কিন্তু গিয়ে দেখি দোকান বন্ধ অনেক খুঁজে সময় কাটানোর মতো কিছুই পেলাম না। তখন ভাবলাম কাবা ঘরে গিয়ে কাবার চারপাশে তাওয়াফ করি। তাওয়াফ করতে গিয়ে দেখলাম সেখানে আমি বাদে আরও একজন আছেন,তিনি মুহাম্মদ। আমি আর তিনি ছাড়া কেউ নেই তবে তিনি আমার উপস্থিতি টের পাননি। রাসূল সাঃ জেরুজালেমের দিকে মুখ করে কাবায় সালাত আদায় করছিলেন। আমি আস্তে আস্তে হেঁটে সামনের দিকে আসলাম।কাবার চাদরের আড়ালে চুপচাপ লুকিয়ে আছি। মুহাম্মদ তখন আমার একদম সামনে দাঁড়িয়ে কিন্তু চাদরের কারণে আমাকে দেখতে পাননি। তার এত কাছে ছিলাম যে তাঁর তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছি। তিনি সূরা আল হাক্কাহ থেকে তিলাওয়াত করছেন। কুরআন শুনে আমার বুক ঠান্ডা হয়ে গেল ভাবলাম এটা কোন কবির কথা। একথা ভাবার পরে সুরা আলহাককার পরের আয়াতে রাসূল সাঃ তিলাওয়াত করলেন

তা হল এগুলো কোন কবির কথা নয় তোমাদের খুব অল্প লোকই সেটা বিশ্বাস করে থাকে।(সূরা হাক্কাহ)

অবাক হয়ে গেলাম নিজেকে বললাম নিশ্চয়ই তাহলে এটা কোন গণকের কথা। এর পরের আয়াতেই ছিল

এগুলো কোন গণকের কথা নয় খুব কমই তোমরা স্মরণ করো (সূরা হাক্কাহ)

একটি বর্ণনা অনুসারে এই ঘটনার পরে উমার ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য মত অনুসারে এ ঘটনা তাকে খুব নাড়া দিলেও মুসলিমদের প্রতি তাঁর ঘৃণা কমে নাই। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে মুহাম্মদকে হত্যা করে তিনি কুরাইশদেরকে রক্ষা করবেন। এরপর নবীজির খোঁজ করা শুরু করলেন। খুঁজে পেলেই হত্যা করবেন। তারপর হঠাৎ জানতে পারলেন দারুল আরকাম এ রাসুল তার ৪০ জন সাহাবী সহ আছেন। উমার একাই চলে গেলেন হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার তিনি জানতেন মুহাম্মদকে হত্যা করতে গেলে তাকেও মেরে ফেলা হতে পারে। কিন্তু তিনি সেসবের পরোয়া করলেন না। রাস্তায় তার এক আত্মীয় নাইমার সাথে তার দেখা হল। নাইমা গোপনে মুসলিম হয়েছিল।নাইমা দেখে বুঝলেন সে খুব রেগে আছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় যাচ্ছো।

মুহাম্মাদ কে হত্যা করতে যাচ্ছি।

অবস্থা গুরুতর দেখে সে বলল তোমার নিজের বাড়ির আগে খবর নাও।

এ কথা বলে উমারের বোন আর তার স্বামীকে সে বিপদে ফেলে দিল।

এবার উমার তার রাস্তা পরিবর্তন করে বোনের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। সেখানে দেখলেন তার বোন আর বোনের স্বামী মিলে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। উমারের পায়ের আওয়াজ শুনে খাব্বাব লুকিয়ে পড়েন। ফাতিমা ও কাগজটা লুকিয়ে ফেলেন। উমার এসে বললেন কি লুকিয়ে ফেললে। তোমরা কিছু তিলাওয়াত করছিলে। তোমরা নাকি মুসলিম হয়ে গিয়েছো। এ কথা বলে তিনি সাঈদ ইবন যাবিত কে আঘাত করলেন। ফাতিমা বাঁচাতে গেলে ফাতিমা কে আঘাত করলেন। ফাতিমার মুখ থেকে রক্ত পড়া দেখে উমার অনুতপ্ত হয়ে বোনের কাছে মাফ চাইলেন।

আমি ও আমার স্বামী দুজনে মুসলিম হয়েছি। তুমি যা খুশি করো।

সে বলল তোমরা যে কাগজটি পড়ছিলে সেটি আমাকে দাও।

ফাতিমা বললেন না দেব না তুমি নাপাক। নিজেকে পরিষ্কার করে ফিরে আসলে তাকে কাগজটি দিলে তিনি তা থেকে প্রথম আয়াত তিলাওয়াত করলেন।

“”ত্বহা। আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি, কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য যারা ভয় করে, এটা তার কাছ থেকে অবতীর্ণ যিনি ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম দয়াময়। আরশে সমুন্নত হয়েছেন নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে এর মধ্যবর্তী স্থান এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে তা তাঁরই।

যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে ও কথা বল তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষা গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই সব সৌন্দর্যমন্ডিত নাম তাঁরই। (সূরা ত্ব-হা) “”

তিলাওয়াত শেষ করে তিনি বললেন কথাগুলো অসাধারণ। খাব্বাব ইবনে আরত এই কথা শুনে বললেন আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনাকে বেছে নিবেন। গতকাল আমি শুনেছি আল্লাহর নবী দোয়া করছিলেন হে আল্লাহ যে কোন একজন উমারকে পথ দেখান। উমার ইবনে খাত্তাব অথবা উমার ইবনে হিশাম নবীজি আল্লাহর কাছে দুজনের একজনের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য দোয়া করেছিলেন। উমার বললেন আমি মুসলিম হতে চাই আমাকে মুহাম্মাদের কাছে নিয়ে চলো। দারুল আরকামে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লে সেই সময় রাসুলুল্লাহ সাঃ সাহাবাদের নিয়ে গোপন বৈঠক করছিলেন। সাহাবাদের মধ্যে একজন উঠে দেখলেন যে উমার এসেছে খানিকটা বিস্ময়ে সে বলল বাইরে উমার দাঁড়িয়ে। তার হাতে তলোয়ার আর একজন সাহাবী সাহস করে দরজা খুললেও তার মুখোমুখি হওয়ার সাহস কারো ছিল না শুধু হামজা রাঃ ছারা।তিনি বললেন হে আল্লাহর রাসূল যদি উমার ভালো নিয়তে এসে থাকে তাহলে আমরা তার সাথে সুন্দর ভাবে বোঝাপড়া করে নেব। যদি সে খারাপ নিয়াতে আসে তাহলে ওর তরবারি দিয়েই ওকে মারবো। রাসূল সাঃ বললেন সমস্যা নেই আমি নিজেই দরজা খুলে ব্যাপারটি দেখছি। রাসুল সাঃ এগিয়ে দরজা খুলে বিশাল দেহের উমারের পোশাক ধরে তাকে টেনে এনে বললেন উমার তুমি কবে এসব বন্ধ করবে। তুমি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাবের জন্য অপেক্ষা করছো। উমার বললেন হে আল্লাহর রাসূল আমি মুসলিম হতে এসেছি। রাসুল সাঃ আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন।রাসুল সাঃ এর আল্লাহু আকবার শুনে অন্য ঘরে থাকা সাহাবীরা বুঝতে পারলেন উমার মুসলিম হয়ে গেছেন। এটা ছিল মুসলিমদের অনেক বড় বিজয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন,, উমার মুসলিম হওয়ার আগে আমরা কখনো কাবা ঘরের সামনে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করতে পারতাম না। তাঁর ইসলাম গ্রহণ পুরো মুসলিম সমাজের পরিস্থিতি বদলে দেয়। তিনি আরো বলেন উনার মুসলিম হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা আমাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতাম। তিনি মুসলিম হওয়ার পর আমরা গর্বের সাথে আমাদের ইসলামের কথা বলে বেড়াতাম। সীরাতের এক বর্ণনা থেকে এসেছে যখন উমার মুসলিম হন রাসূল সাঃ মুসলিমদের দুই সারিতে দাঁড় করাতেন একসারির নেতা হামজা

আরেক সারির নেতা উমার। তাঁরা ইসলামের ঘোষণা দিতে দিতে মক্কার রাস্তায় হাঁটতে থাকতেন আর দুই সারির মধ্য দিয়ে রাসুল সাঃ হেঁটে যেতেন।

দুঃখের বছর

নবুওয়াতের দশম বছরে শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি তে নবীজির চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন।এ জন্য মক্কা জীবনের দশম বছর কে বলা হয় আমুল হুজুন বা দুঃখের বছর। যিনি রাসুল সাঃ কে পরম মমতায় আগলে রাখতেন। তিনি আজ মৃত্যু শয্যায় শায়িত। রাসূল সাঃ বললেন। চাচাজান আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন।

আপনি স্বীকার করে নিন আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই আপনি আমাকে কথাগুলো বলে যান যেন আমি শেষ বিচারের দিন আপনার পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিতে পারি। আপনার শাস্তি মওকুফের জন্য আমার রবের কাছে আবেদন করতে পারি। আপনি শুধু বলুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এছাড়া আমি আপনার কাছে আর কিছু চায়না। তখন আবু তালিব এর অপর পাশে বসা ছিল আবু জেহেল। আবু তালিবের একপাশে রাসুল সাঃ আর এক পাশে আবু জেহেল। আবু জেহেল বলল আবু তালিব তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীন ছেড়ে অন্য দ্বিনের উপর মারা যেতে চাও। শেষ পর্যন্ত তুমি বাপের দ্বিন ত্যাগ করবে। রাসুল যতই অনুরোধ করলেন আবু জেহেল ততই তাকে বাধা দিতে থাকলেন। অবশেষে আবু তালিব বললেন আমি আমার পিতা আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীনের উপরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব। এটাই ছিল মৃত্যুর আগে তার শেষ কথা। আবু তালিব মারা গেলেও রাসুল সাঃ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে মনস্থির করেন।জীবনের ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে আগলে রেখেছিলেন । কিন্তু তাঁর প্রিয় চাচা যখন কাফের হিসেবে মারা যাচ্ছিল সেটা সহ্য করা তাঁর জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। তাই তিনি তাঁর জন্য দোয়া করার মনস্থির করলেন। তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন

“”নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। যদিও তারা আত্মীয় হোক এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামি।(সূরা তাওবাহ)””

আবু তালিব রাসুল সাঃ এর প্রতি সহানুভতিশীল ছিলেন। কিন্তু কুরাইশদের তার প্রতি সম্মান তাকে বাধা দিল মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করায়। তখন আল্লাহ আয়াত নাজিল করেন

“”’আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে সৎ পথে আনতে পারবেন না তবে আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনয়ন করেন। কে সৎ পথে আসবে সে সম্পর্কে তিনি ভালো জানেন যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে হেদায়েত দান করেন।
আপনার কাজ শুধু আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া ঈমান আনার উপরে ইসলাম জবরদস্তি সমর্থন করে না।

দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই নিঃসন্দেহে হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে অতএব যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো যা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয় আর আল্লাহ সবই শুনেন সবই জানেন।
(সূরা বাকারা)

আবু তালিবের মৃত্যুর শোক কাটাতে না কাটাতেই তার দুই মাস পরে মারা যান তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা তাই এ বছরকে বছর বলা হয় শোকের বছর।পূর্বেই আমরা জেনেছি খাদিজা রাঃ, আবু তালেব কিভাবে দ্বীনের কাজে সাহায্য করেছেন রাসুল সাঃ কে।এ বছরটি রাসূলের জীবনের ছিল সবচেয়ে কষ্টের বছর।

ইসরা ও মিরাজ

ইবনুল কাইয়্যেম এর প্রাপ্ত তথ্যাদির বর্ননা অনুসারে, রাসুলুল্লাহ সাঃ কে স্বশরীরে বুরাকের (একটি বাহন অথবা দ্রুতগামী কোনে জন্তু)উপর আরোহন করিয়ে জিব্রাইল আঃ মসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস অবতরণের পর, নবীগণের জামাতে ইমামত সহকারে সালাত আদায় করেন এবং বুরাককে মসজিদের দরজার আংটার সাথে বেঁধে রাখেন। সালাত আদায়ের পর পুনরায় তাকে বুরাকে করে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। জিব্রাইল আঃ রাসুল সাঃ এর জন্য প্রথম আসমানের দরজা খোলার আবেদন জানালে অনুমতি দেয়া হয় সেখানে মানুষের আদি পিতা আদম আঃ এর রাসুলের সাথে সাক্ষাৎ হয় রাসূল সাঃ তাঁকে শ্রদ্ধা ভরে সালাম জানান। আদম আঃ সালামের জবাব দিয়ে তার নবুয়্যতের স্বীকার করে নেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ডান দিক থেকে আল্লাহর নেককার বান্দাদের এবং বামদিকে বদকার বান্দাগণের আত্মসহ তাকে প্রদর্শন করালেন। এরপর তাঁকে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে ইয়াহইয়া বিন জাকারিয়া এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি শ্রদ্ধাভরে সালাম জানালে সালামের জবাব জানিয়ে তিনি ও তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জানান। তৃতীয় পর্যায়ে তাঁকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ইউসুফের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা ভরে সালাম জানান। তিনিও সালামের জবাব দিয়ে মোবারকবাদ জানিয়ে তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন। তারপর তাঁকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ইদ্রিস আঃ কে দেখেন এবং শ্রদ্ধা ভরে সালাম জানান। তিনি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মোবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়তের স্বীকারোক্তি করেন। পঞ্চম আসমানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তিনি হারুন বিন ইমরানকে দেখতে পান এবং তাঁকে শ্রদ্ধা ভরে সালাম জানান। তিনি সালামের জবাব দিয়ে মোবারকবাদ জানিয়ে তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জানান। তারপর রাসূল সাঃ এর ষষ্ঠ আসমানে মুসা বিন ইমরানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা ভরে সালাম জানান। সালামের জবাব দিয়ে মোবারকবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করে নেন। এরপর রাসূল সাঃ যখন সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন তিনি ক্রন্দন করেন। তাঁকে ক্রন্দন করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, এমন কোন যুবককে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে তাঁর উম্মতগণ আমার উম্মতের তুলনায় অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তারপর

তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সপ্তম আসমানে। সপ্তম আসমানে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর সঙ্গে তিনি রাসূল সাঃ এর সালাম এর জবাব ও মোবারকবাদ জানিয়ে তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন। অতঃপর তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠিয়ে নেওয়া হয়। তার পত্র গুলো হাতির কানের মত। সেই বৃক্ষকে স্বর্ণের প্রজাপতি ও জ্যোতি আচ্ছন্ন করে ফেলল। ফলে তা এমন রূপে পরিবর্তিত হলো যা কোন সৃষ্টির পক্ষেই তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। চলার শেষ পর্যায়ে তাঁকে বায়তুল মামুরে নিয়ে যাওয়া হয়। বায়তুল মামুর এমন এক ঘর যাতে প্রত্যেকদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে ইবাদাতের জন্য। অতঃপর তারা আর সেখানে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে না। এরপর তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেন সেখানে রয়েছে মতি নির্মিত রশ্মি। জান্নাতের মাটি হল মিশক নামক সুগন্ধির তৈরি।এর পর সম্মানিত রাসুল, অবিনশ্বর অসীম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে। পর্দার এক পাশে রাসূল সাঃ অপর পাশে অদ্বিতীয় স্রষ্টা। সর্বশক্তিমান রব আর প্রিয়তম নবীর মধ্যখানে রয়েছে দু'ধণুকের সমপরিমাণ ব্যবধান কিংবা তার চেয়েও কম। অভূতপূর্ব সেই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হলো। হাদিয়া স্বরুপ দেয়া হলো ৫০ ওয়াক্ত ফরজ সালাত। এরপর শুরু হল আবার পৃথিবীতে ফেরার পালা। ফিরতে পথে এক পর্যায়ে সাক্ষাৎ হলো মুসা আঃ এর সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন ৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের।মুসা আঃ বললেন বনী ইসরায়েলের সঙ্গে আমার অনেকটা সময় কেটেছে মানুষের ফিতরাত আমি সেজন্য অনেকটাই বুঝতে পারি। আপনার উম্মাতের পক্ষে সম্ভব হবে না ৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা।তিনি বললেন আপনার উম্মতের উপর এই দায়িত্ব হালকা করে নেয়ার জন্য আপনি অনুরোধ করুন। জিব্রাইল আঃ পুনরায় তাঁকে আল্লাহর দরবারে নিয়ে গেলেন।কয়েক দফার, শেষের ফায়সালাতে সর্বশেষ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারিত হয়।যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দেয়া হলো তখন মুস আঃ রাসূল সাঃ কে বললেন আরো কিছুটা হালকা করার জন্য।উত্তরে রাসুল সাঃ বললেন এ ব্যাপারটি নিয়ে আল্লাহতায়ালার দরবারে যেতে আমি লজ্জা বোধ করছি। এবং অত্যন্ত সন্তুষ্টির সঙ্গে আমি দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মেনে নিলাম বলে তিনি সম্মুখের দিকে এগিয়ে চললেন। এ সময় পুনরায় রাসূল সাঃ এর বক্ষবিদারনের ঘটনা ঘটে এবং রাসূল সাঁ কে এই ভ্রমনে কয়েকটি জিনিসও দেখানো হয়েছিল। জান্নাতে চারটি নদী দেখানো হয়েছিল এর মধ্যে দুটি প্রকাশ্য আর দুটি অপ্রকাশ্য । প্রকাশ্য দুটি হচ্ছে নীল নদ ও ফোরাত।তাদেরকে

দেখিয়েছিলেন যারা অন্যায় ভাবে এতিমের মাল আত্মসাৎ করে, তাদের ঠোঁটের আকার আকৃতি উঠের ঠোঁটের মত। সুদখোরদের পেটগুলো এতই প্রকাণ্ড ছিল যে পেটের ভার বহন করা তাদের কষ্টকর হচ্ছিল। ব্যভিচারীদের সামনে টাটকা গোস্ত ছিল এবং তার পাশে দুর্গন্ধযুক্ত পচা গোস্ত ছিল। টাটকা গোস্ত বাদ দিয়ে এরা পচা গোস্ত খাচ্ছিল। যাতায়াতের সময় রাসুল সাঃ আরব বাসীদের এক বণিক দলকেও দেখেছিলেন এবং তাদের এক পাল উট ও দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের পানিও পান করিয়েছিলেন। ওই পানি একটি পাত্রে ঢাকা ছিল এ সময়ে বণিকেরা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। পানি পান করার পর পুনরায় তিনি পাত্রটিকে ঢেকে রেখেছিলেন। মিরাজের রাত্রি শেষে সকালবেলা এ ঘটনাটি তার যাএার সত্যতা প্রমাণের দলিল হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। ইবনুল কাইয়ুম বলেন যখন রাসুল সাঃ সকালে তাঁর গোত্রের লোকজনের কাছে আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনের কথা বর্ণনা করেন, তখন তারা তাঁকে মিথ্যুক, পাগল জাদুকর বলে প্রমাণ করতে চাইলো। কিন্তু যাতায়াতের সময় তিনি যে কাফেলা দেখেছিলেন তার বর্ণনা করায় সেটা সত্য বলে প্রমাণিত হলো। আবু বকর একথা শোনা মাত্র সত্য বলে মেনে নেন। যখন কুরাইশদের উপর মহান আল্লাহর সকল দলিল প্রমাণ সম্পন্ন হয় তখন নবীজির এই বরকতময় সফর সম্পর্কে তারা এসব জাদু আর তাঁকে জাদুকর আখ্যা দিয়ে মজলিস থেকে উঠে পড়ে।

তায়েফ গমন

আবু তালিবের মৃত্যুর পর ক্রমশ রাসুলের প্রতি সবার নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে ইবনে ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবূ ত্বালিব মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাঃ কে

এত কষ্ট দেন যা আবূ ত্বালিবের জীবদ্দশায় কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। একদিন এক নির্বোধ ও গোঁয়ার প্রকৃতির কুরাইশ রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সামনে এগিয়ে এসে মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করে দেয়। সেই অবস্থাতেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর এক কন্যা সেই মাটি ধুইয়ে পরিস্কার করে দেন। ধোয়ানোর সময় তিনি ক্রন্দন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁকে

সান্ত্বনা দানের জন্য বললেন, (لَا تَبْكِي يَابُنَيَّةُ، فَإِنَّ اللهَ مَانِعُ أَبَاك)

"পুত্রী ক্রন্দন কোরো না। আল্লাহই তোমার পিতার হিফাজতকারী।"

(مَا نَالَتْ مِنِّي قُرَيْشٌ شَيْئًا أَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُو طَالِب)

"যতদিন আমার চাচা আবূ ত্বালিব জীবিত ছিলেন কুরাইশগণ আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে নি যা আমার সহ্যের বাইরে ছিল।

রাসুল সাঃ মক্কার বাইরে দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা চালাতে লাগলেন। দাওয়াত পৌঁছানোর লক্ষ্যে তিনি তায়েফে যান। তাঁর সাথে ছিল যাইদ বিন হারিসা। তিনি সেখানে দশ দিন অবস্থান করেন এবং নেত্রী স্থানীয় সকলকে দ্বীনের দাওয়াত দেন। তাদের একই কথা বের হয়ে যাও। রাসূল সাঃ বললেন ঠিক আছে আপনারা যদি আমার আহবানে সাড়া না দেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। তবে আমি চাই আমাদের মধ্যে যে আলাপ হয়েছে তা আপনারা মক্কার লোকেদের কাছে গোপন রাখবেন। তারা এতটাই খারাপ ছিল তাদের গোত্রের কিছু উশৃংঙ্খল মানুষদেরকে রাসূল সাঃ এর পিছনে লেলিয়ে দেয়। তারা রাসূলকে গালাগাল করে, পাথর ছুড়তে লাগলো। তাঁরা দৌড়াতে লাগলেন, দৌড়াতে দৌড়াতে আবাদি জমিতে গিয়ে আশ্রয় নেন।রাসুল সাঃ কে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে ঢাল হিসেবে রাখলেন যায়েদ

ইবন হারিসা। রাসুল সাঃ গুরুতর আহত হন তার শরীর থেকে এত রক্ত ঝরতে থাকে যে তাঁর জুতা পর্যন্ত ভিজে যায়।রাসুল সাঃ এর জীবনের সবচেয়ে বিষাদময় দিন ছিল উহুদের দিন। বহুদিন পরের কথা আইশা রাঃ জানতে চাইলেন, ইয়া রসুল আল্লাহ, উহুদের দিনের চাইতে মারাত্মক কোন দিন কি আপনার জীবনে আপনি দেখেছেন। রাসুল সাঃ বললেন হ্যাঁ দেখেছি। সেটি ছিল তায়েফের দিন। আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলাম কিন্তু তারা গ্রহণ করেনি। আমি সেদিন মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত ছিলাম। মাঝপথে এসে দেখি মাথার উপর এক টুকরো মেঘ। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখি জিবরীল আঃ। তিনি আমাকে বললেন আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে আল্লাহ তাআলা সবই শুনেছেন। আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাদের পাঠানো হয়েছে। এরপর পাহাড়ের ফেরেশতারা আমাকে সালাম জানালেন বললেন,

ইয়া আল্লাহর রাসূল আপনি যদি চান ওদেরকে দুই পাহাড়ের মধ্যে পিষে দিব। আমি বললাম না আমি আশা করি আল্লাহ তাআলা তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে। আবার তিনি চলতে শুরু করলেন থামলেন ওয়াদিয়া নাখলায়। সেখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করলেন। একদিন তিনি কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন সেই এলাকায় কিছু জিন ছিল তারা শুনে মুগ্ধ হয়ে আয়াত শিখে শেষ পর্যন্ত মুসলিম হয়ে যায়। জ্বীনদের আগমন আর ইসলাম গ্রহণ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় সাহায্য। রাসুল সাঃ স্বস্তি পেলেন।

আকাবার প্রথম শপথ

রাসুল সাঃ আবার মক্কায় ফিরে আসলেন। কিন্তু মক্কায় অবস্থান করা তাঁর জন্য বেশি একটা সুবিধার ছিল না। কারণ তায়েফের ঘটনা মক্কাবাসীর কানে পৌঁছে গিয়েছিল। আল্লাহর রাসূল আরবের বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতিদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। নিজের নবী পরিচয় দিয়ে তাঁদেরকে আশ্রয়ের কথা বললেন। কিন্তু তারা সবাই অস্বীকার করল। তারা বলতে থাকলো যে নিজের গোত্রের লোকেদের বিরুদ্ধে এমন আচরণকারী কাউকে আমরা আশ্রয় দিতে পারি না। বনু সাকিফ গোত্রের লোকেরা রাসুলের সাথে সবচেয়ে বেশি দুর্ব্যবহার করে।রাসুল সাঃ আবু বকর রাঃ কে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। কারণ তাঁর বিভিন্ন গোত্রের বংশপরিচয় সম্পর্কে ভালো ধারনা ছিল।তিনি দ্বিনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিলেন। এক টানা দীর্ঘ ১০ বছর তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। আরবের এমন কোন মজলিস নেই এমন কোন সভা নেই যেখানে গিয়ে তিনি সত্যের দাওয়াত দেন নি। কিন্তু প্রতিউত্তরে সবাই তাকে কষ্ট দিয়েছে, ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে। তারা বলতো নিজের গোত্রকে আগে মুসলমান বানান তারপর আমাদের হেদায়েত করতে আসবেন।এভাবে অনেক সময় চলে যায়। তারপরে আল্লাহ চান মদিনায় ইসলামের প্রসার ঘটুক। আল্লাহ চান ইসলামের উন্নতি হোক তখন তিনি মদিনার আউস গোত্রের কতিপয় লোক কে নবীজির কাছে পাঠিয়ে দেন। যাদের মধ্যে আসাদ ইবনু জুরারা ও জাকওয়ান ইবনু আবদি কায়েস নামের দুজন সে বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী বছর আরও কিছু লোক আসেন যাদের মধ্যে ছয় জন বা আট জন ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল সাঃ তাদেরকে বলেন যে তোমরা কি আমাকে আল্লাহর বাণী প্রচারে সাহায্য করবে। তারা জবাব দেয় আল্লাহর রাসুল বর্তমানে আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এর মধ্যে আপনি মদিনায় তাসরিফ নিলে সবাই বায়আতের ব্যাপারে একমত হবে না। আপনি এক বছরের জন্য এ সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখুন। পরবর্তীতে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এক বছরের মধ্যেই আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ থেমে যায়। পরের বছর হজের মৌসুমে ১২ জন লোক নবীজির কাছে যান এর মধ্যে দশজন ছিল খাজরাজের আর দুজন আউস গোত্রের। তাদের মধ্যে যারা গত বছর মুসলমান হয়নি তারাও মুসলমান হয়ে যান। সবাই নবীজির হাতে বায়আত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেব।যা আকাবার প্রথম শপথ বা প্রথম

আকাবা নামে অভিহিত করা হয়। তারা মুসলমান হয়ে ফিরে যাওয়ার পর মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা শুরু হয়।

আকাবার দ্বীতিয় শপথ

আউস ও খাজরাজের দায়িত্বশীলগন নবীজির কাছে চিঠি লেখেন।চিঠি পেয়ে নবীজি মুসআব ইবনু উমায়ের রাঃ কে লোকেদের শিক্ষা দিতে মদিনা পাঠালে ইসলামের প্রথম মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। তারপরের বছর মদিনা থেকে একটা বড় কাফেলা মক্কায় আসে। সে কাফেলায় ৭০ জন পুরুষ ও দুজন মহিলা ছিলেন। নবীজি তাদের আকাবায় স্বাগত জানিয়ে আকাবার কাছে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দেন। সাথে নবীজির চাচা আব্বাস রাঃ ছিলেন। আব্বাস সবাইকে সম্বোধন করে বলেন এ আমার ভাতিজা মুহাম্মদ সর্বদা আপন গোত্রে সম্মান ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করে আসছে। আপনারা যারা তাঁকে মদিনায় নিয়ে যেতে চাইছেন তাঁরা ভেবে দেখুন যদি আপনারা তাঁর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করতে পারেন এবং শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে পারেন তবে এ দায়িত্ব গ্রহন করুন অন্যথায় তাঁকে তাঁর নিজের গোত্রে থাকতে দিন। এই কথার জবাবে মদিনার কাফেলা প্রধান বলেন নিশ্চয়ই আমরা এই দায়িত্ব নিচ্ছি এবং তাঁর সঙ্গে কৃত বায়আতের পূর্ণ বাস্তবায়ন ই আমাদের একমাত্র কাম্য। একথা শুনে এই অঙ্গীকার ও বায়আতকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে আসআদ ইবনু জুরারা রাঃ দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা কি বুঝতে পারছ কোন বিষয়ে বায়আত করতে যাচ্ছ? এই বায়আত পুরো আরব ও অনারবের বিরোধিতা এবং মোকাবিলার অঙ্গীকার। যদি তোমরা এটাকে পূরণ করতে পারো তবেই বায়আত সম্পাদন করো। অন্যথায় নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে দাও। একথা শুনে সবাই এক বাক্যে বলে ওঠেন আমরা কোন অবস্থাতেই এই বায়আত থেকে পিছু হটবো না। এরপর তারা বলেন আল্লার রাসুল আমরা যদি এই অঙ্গীকার পূরণ করি তাহলে আমরা কি প্রতিদান পাব? তিনি বলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতে।এ কথা শুনে সবাই বলে ওঠে আমরা এতেই সন্তুষ্ট আছি। আপনি আপনার পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিন আমরা বায়আত করব। তিনি তখন হাত বাড়ান আর সবাই তার বায়আত লাভে ধন্য হন। এই বায়আতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ৭৩ জন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা।এই বায়আতের নাম বায়আতে আকাবায়ে সানিয়া বা আকাবার দ্বিতীয় বায়আত। এরপর নবী সাঃ তাঁদের মধ্য থেকে ১২ জনকে পুরো কাফিলার দায়িত্ব প্রদান করেন।

মদীনায় হিজরত

এই বায়আত সম্পর্কে জানার পর কুরাইশরা আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তারা তাদের অত্যাচারের সীমা আরও বাড়িয়ে দেয় এমন কোন নির্যাতন নেই যে তারা সেটা মুসলমানদেরকে করতে বাঁকি রাখেন।তখন নবীজি সাঃ সাহাবীদের মদিনায় হিজরত করতে বললেন। সাহাবীরা দু একজন করে কুরাইশদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় যেতে থাকেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত মক্কায় নবীজি সাঃ, আবু বকর রাঃ এবং কয়েকজন দুর্বল মুসলমান ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকেন না। আবু বকর হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু নবীজি নিষেধ করেন। নবীজি বলেন এখানে থেকে যাও যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে হিজরত করার অনুমতি না দেন। ফলে আবু বকর রাঃ নবীজির হিজরতের অনুমতি আসার নির্দেশে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন এবং সফরের উদ্দেশ্যে দুটি উট ও প্রস্তুত করেন। কুরাইশের কাফিররা সমস্ত বিষয়ে জানলে তারা নবীজির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে দারুন নাদওয়ায় সমাবেত হন। কেউ কেউ তাঁকে বন্দীর পরামর্শ দেয়। কেউ দেয় দেশান্তরের পরামর্শ। লোকেরা তাঁকে বন্দীর পরামর্শ ও সমর্থন করেন না কারণ তারা জানে দেশান্তর হলেও সেটা মক্কার আশেপাশের সকলে তাঁর উত্তর চরিত্র মিষ্টি কথায় সবাই তাঁর অনুগত হয়ে যাবে এবং তখন তিনি তাদের সবাইকে নিয়ে আক্রমণ করে বসতে পারেন। আবু জেহেল পরামর্শ দেয় যে তাঁকে হত্যা করা হোক। প্রত্যেক গোএ থেকে একজন কে নির্বাচন করা হয় যাতে নবীজির গোত্র এ হত্যার প্রতিশোধ নিতে না পারে। সবাই তখন এই প্রস্তাবকে পছন্দ করে এবং প্রত্যেক গোএ থেকে একজন করে যুবককে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয় এবং কোন রাতে এ কাজ সম্পন্ন করা হবে সেটা বলে দেয়া হয়। আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা নবীজিকে এ ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন এবং দ্রুত হিজরতের নির্দেশ দেন। যে রাতে কাফেররা নবীজির বাড়ি ঘেরাও করে সে রাতে তিনি হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় আলীকে বলেন তিনি যেন তার খাটে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেন যাতে কাফেররা এটা জানতে না পারে যে তিনি ঘরে নেই। এরপর নবীজি যখন ঘর থেকে বের হন, তখন তার দরজার কাফেরদের যেন মেলা জমে। তিনি সুরা ইয়াসিন পড়তে পড়তে ঘর থেকে বের হন।

আমি তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিয়েছি ফলে তারা দেখতে পায় না (সূরা ইয়াসিন)

এই আয়াত পর্যন্ত যখন পৌঁছান তখন আয়াতটি কয়েকবার তিলাওয়াত করেন এর ফলে আল্লাহ কাফেরদের চোখে পর্দা ফেলে দেন তারা নবীজিকে দেখতে পায়নি। এরপর তিনি আবু বকরের বাড়িতে যান। আবু বকর আগেই প্রস্তুত ছিলেন এবং একজন পথ পথপ্রদর্শক ও প্রস্তুত রাখেন। এভাবে আবু বকর তাঁর সঙ্গী হন এবং তাঁরা বাড়ির পেছনের দিক দিয়ে ছোট একটি দরজা দিয়ে বেড়িয়ে সাওর পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যান।

সাওর গুহায় অবস্থান

আবু বকরকে নিয়ে রাসুল সাঃ সাওর পর্বতের একটি গুহায় অবস্থান নেন। অন্যদিকে কুরাইশরা নবীজির ঘরের সামনে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন যে নবীজি কখন ঘর থেকে বের হবেন। পরে তারা যখন জানতে পারেন নবীজির বিছানায় আলী শুয়ে আছেন তখন তারা বেশ অবাক হয় এবং চতুর্দিকে নবীজির সন্ধানে গুপ্তচর পাঠায়। এবং ঘোষনা দেয় যে নবীজিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসতে পারবে তাকে ১০০ উট প্রদান করা হবে। অনেকেই এই পুরস্কারের লোভে নবীজিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে এমনকি যারা পায়ের চিহ্ন ধরে খুঁজতে অভিজ্ঞ, সেসব লোকজন ও একেবারে কাছে পৌঁছে যায়,পরিস্থিতি এমন যে তারা সামান্য একটু নুয়ে তাকালে নবীজিকে দেখতে পারে।আবু বকর রাঃ এই সময় খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। নবীজি তাঁকে চিন্তা করতে বারণ করেন। নবীজি বলেন ভয় পেয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আল্লাহ সুবাহানুওয়াতায়ালার অপার মহিমায় কাফিরদের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়। এমনকি তাদের মধ্যকার সবচেয়ে ধূর্ত ব্যক্তি উমাইয়া ইবনু খালফ বলে ওঠেন এখানে তার থাকা অসম্ভব। কেননা আল্লাহর নির্দেশে মাকড়সা সেখানে জাল বুনে রেখেছিল এবং বন্য কবুতর গুহাটির প্রবেশপথে বাসা তৈরি করে ফেলেছিল। আবু বকর রাঃ ও নবীজি সাঃ তিন দিন তিন রাত এই গুহায় আত্মগোপনে থাকেন। আবু বকরের ছেলে রাতের অন্ধকারে তাদের কাছে যেতেন এবং ভোর হওয়ার আগে মক্কায় ফিরে আসতেন। তিনি কুরাইশদের সংবাদ সংগ্রহ করে রাতে নবীজির কাছে তা বর্ণনা করতেন অপরদিকে তার বোন আসমা বিনতে আবু বকর প্রতিরাতে তাঁদের কাছে খাবার পৌঁছে দিতেন। যেহেতু আরবের কিছু কিছু লোক পদচিহ্ন সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা রাখত, তাই আব্দুল্লাহ রাঃ তাঁর গোলামকে বলে রেখেছিলেন যেন সে প্রতিদিন গুহা পর্যন্ত তার ছাগল চরাতে নিয়ে যায়,যেন পদচিহ্ন গুলো মুছে যায়।

সাওর থেকে মদিনায়

সাওর গুহায় অবস্থানের তৃতীয় দিন চার রবিউল আউয়াল সোমবার আবু বকর রাঃ তাঁর আজাদকৃত গোলাম আমির ইবনু ফুহায়রা রাঃ সেই উট দুটি নিয়ে উপস্থিত হন। যেগুলোকে তিনি এ সফরের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আব্দুল্লাহ ও গিয়ে উপস্থিত হন। যাকে তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথ দেখাতে সঙ্গে নিয়েছিলেন।নবীজি এক উটে আর আবু বকর আরেক উটে আরোহন করেন।আবু বকর খিদমতের জন্য আমির ইবনু ফুহায়রাকেও নিজের পাশে বসান,আর আব্দুল্লাহ ইবনু উড়াইকিত রাস্তা দেখিয়ে দিতে আগে আগে চলেন। নবীজিরা মদিনার পথ ধরে এগিয়ে চলছেন।সুরাকা ইবনু মালিক কুরাইশ কাফিরদের দুত নবীজিকে খুঁজে ফিরছিল। খুঁজতে খুঁজতে সে নবীজির সন্ধান পেয়ে যায়। এমনকি নবীজির কাছে পর্যন্ত চলে যায়। আবু বকর তার গতিবিধি বারবার খেয়াল করছিলেন। কিন্তু নবীজি ফিরেও তাকাচ্ছিলেন না। এত কাছে সে চলে আসে যে নবীজির তেলাওয়াত ও সে শুনতে পায়। যখন সে নবীজির একেবারে কাছে চলে আসে তখন মরুভূমির শক্ত মাটিতে তার ঘোড়ার চারটি পা হাঁটু পর্যন্ত ধেবে যায়। সুরকা তখন মাটিতে ছিটকে পড়ে এবং বারবার ঘোড়ার পা উঠাতে চেষ্টা করে কিন্তু সে সমর্থ্য হয় না। পরে নবীজির কাছে সাহায্য চাইলে নবীজির বরকতে ঘোড়ার পা মাটি থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর পা থেকে এক ধরনের ধোঁয়া বের হয় এটা দেখে সে আরো ভয় পেয়ে যায়। সে এটিকে নবীজির খেদমতে পেশ করতে চাইলে নবী সাঃ অস্বীকৃতি জানান। যেহেতু সে ইসলাম গ্রহণ করেনি তাই তিনি এটা নিতে পারবেন না তিনি বলেন তুমি আমাদের অবস্থান সম্পর্কে কাউকে বলবেনা এটাই যথেষ্ট হবে। অতঃপর সে সেখান থেকে ফিরে আসে এবং যে পর্যন্ত ক্ষতির আশংকা থাকে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করে না। কিছুদিন যাওয়ার পর আবু জেহেল এর কাছে ঘটনাগুলো বর্ণনা করে বলে যে, তুমি যদি আমার ঘোড়াটির পা হাঁটু পর্যন্ত জমিনে ধেবে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে তাহলে বুঝতে পারতে এবং এ ব্যাপারে তোমার কোন সন্দেহ থাকতো না যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল সুতরাং এমন কে আছে যে তার সমকক্ষ হতে পারে কাজেই আমার মত হচ্ছে তোমার জন্য উচিত হবে তুমি নিজে তার বিরোধিতা থেকে বিরত থাকবে এবং লোকেদেরও বিরত রাখবে। কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি একদিন তার বিজয়ের নিদর্শন ফুটে উঠবে তখন সকল মানুষই এই কামনা করবে যে আমরা যদি তার সঙ্গে সন্ধ্যি করে নিতাম তাহলে কতই

না ভালো হতো। মদিনার পথে চলতে চলতে নবীজি উম্মে মাবাদ নামের এক মহিলার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের বকরিগুলো দুধের খরায় ভুগছিলো। নবীজি ওলানে হাত দিলে তার বরকতে ওলান দুধে পূর্ন হয়ে ওঠে।তা থেকে তিনি পান করেন এবং তাঁর সাথীদেরকেও পান করান।উম্মে মাবাদের স্বামী ফিরে এলে তিনি বর্ণনা করেন, আজ আমাদের বাড়িতে অত্যন্ত ভদ্র সম্মানিত এক যুবক কিছুক্ষণের জন্য মেহমান হয়েছিলেন এসব তারই পবিত্র হাতের বরকত। এ কথা শুনে তার স্বামী বলেন আল্লাহর শপথ আমার মনে হচ্ছে তিনি মক্কার সেই মহান পুরুষই হবেন। এক বর্ণনায় রয়েছে এরপরে বেদুইন এই দম্পতি হিজরত করে মদিনায় চলে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। এখান থেকে বেরিয়ে নবীজি কুবাই যান। নবীজির আগমনের কথা যখন থেকে জানতে পেরেছিলেন আনসাররা তখন থেকেই তাঁরা গভীর আগ্রহ নিয়ে তাঁর আগমনের অপেক্ষা করতেন। তাঁরা সেদিন ও সবাই মহল্লা থেকে বেরিয়ে যথারীতি অপেক্ষা করে ফিরে যাচ্ছিলেন হঠাৎ একটি আওয়াজ এল এতদিন তোমরা যার অপেক্ষা করছিলে তিনি চলে এসেছেন। নবীজিকে আসতে দেখে তাঁরা অনেক আন্তরিকতার সাথে তাঁকে সংবর্ধনার সঙ্গে বরণ করে নেন। নবীজি ও তাঁর সাথীরা ১৪ দিন সেখানে অবস্থান করেন। কুবায় একটি মসজিদ তিনি সেই সময় স্থাপন করেন যা ইসলামের প্রথম মসজিদ। নবীজির আমানতদারিতার স্বীকৃতি কাফেরদের কাছেও ছিল তাই তার কাছে কিছু না কিছু মানুষের গচ্ছিত আমানত ছিল। হিজরতের সময় এ কারণে তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মক্কায় রেখে যান এবং সেগুলো তাদের মালিকের হাতে পৌঁছে দিতে নির্দেশ দেন। নির্দেশমত আলী রাঃ মালিকদের হাতে গচ্ছিত আমানতগুলো ফিরিয়ে দিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা করেন এবং কুবায় নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে উমার রাঃ ইসলাম হিজরি সনের সূচনা করেন এবং মুহাররামকে ইসলামি বর্ষপনিজকার প্রথম মাস নির্ধারন করেন।রবিউল আউয়াল মাসের শুক্রবার দিনে নবীজি কুবায় থেকে মদিনার দিকে রওনা দেন। মদিনার আনসাররা তখন আনন্দে ফেটে পড়ে। সবাই তার উটের লাগাম ধরতে চেষ্টা করছিলেন। সবাই চাচ্ছিলেন নবীজি যেন কিছুদিন তাদের ঘরের মেহমান হন।পথের মধ্যে যার বাড়ি পড়তো তিনিই নবীজির কাছে আবদার করেন, আমার দরিদ্র এ ঘরে তাসরিফ রাখুন। তিনি তাদের বলেন তোমরা উটকে নিজের মতো করে চলতে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ প্রাপ্ত তাকে যেখানে থামার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে সে নিজেই থেমে যাবে। ফলে সেটি তার মত করে চলতে লাগলো পরে নবীজির মামার বংশ আদি ইবনু নাজ্জার

গোত্রের মহল্লায় আবু আইয়ুব আনসারী এর বাড়ির সামনে গিয়ে উটটি বসে পড়ে। তখন নবীজি তাঁর বাড়িতে মেহমান হয়ে যান এবং কিছুদিন থাকেন। তখন মদিনায় কোন মসজিদ ছিল না। যেখানে সুযোগ হতো তিনি সেখানে নামাজ পড়তেন। নবীজি মদিনায় পৌঁছার পর উটনীটি যেখানে প্রথম থামে সে জায়গাটি কিনে সেখানে মসজিদে নববী নির্মান করেন। এ মসজিদের দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছ আর ছাদ খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি ছিল। বায়তুলমাকদিস ছিল তখন পর্যন্ত মুসলিমদের কাবা। মসজিদের সঙ্গে দুটি কক্ষ তৈরি করা হয় একটি আয়েশা রাঃ আর অন্যটির সাওদা রাঃ এর জন্য। এরপর নবীজি মক্কায় লোক পাঠিয়ে তার পরিবারের লোকদের মদিনায় নিয়ে আসেন। আবু বকর ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে মদিনায় নিয়ে আসেন ফলে উম্মুল মুমিনীন সাওদা এবং নবীজির দুই মেয়ে ফাতেমা ও কুলসুম মদিনায় চলে আসেন। যাদের সফর করা শক্তি ছিল না এমন কিছু দুর্বল মুসলমান মক্কায় রয়ে যান তবে তাদের কেউ কেউ মদিনার উদ্দেশ্যে বের হলেও পথের মাঝেই ইন্তেকাল করেন।

নবীজির জীবনের পুরো ৫৩ বছর এমন অবর্ননীয় কষ্ট ও নির্যাতন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে যা লিখে কিংবা বলে প্রকাশ করা সম্ভব না। অসহায় অবস্থার পর ইসলাম যখন অনেকটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন ও কোনো অত্যাচারির অত্যাচারের জবাব কিংবা কারো গায়ে হাত ওঠানো হয় নি।কুরআনে তখন ও তাঁদের ধৈর্য্য ধারন ও দৃঢ়তা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। কোনো অস্ত্র ব্যাবহারের অনুমতি দেয়া হয় নি।তখন কুরআনে যে জিহাদের কথা বলা হয়েছিল তা ছিল উপদেশ মুলক।এরপরেও যদি কাজ না হয় পারস্পরিক বিতর্কের উদ্ভব হয়। তাহলে কৌশল ও নরম কথার মাধ্যমে তাদের মোকাবেলা করতে বলা হয়েছে। এরপরে ও না হলে পূর্ণ জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে । ইসলাম তার প্রচার প্রসারে তরবারির মুখাপেক্ষী নয়। এমনকি ময়দানে তুমুল যুদ্ধের সময় ও ইসলাম কাউকে নির্বিচারে হত্যার হুকুম দেয় নি।কেবল তাদেরকেই হত্যার হুকুম দেয়,যারা ইসলামকেই নিশ্চিহ্ন করতে চায়তো। যে সকল লোক চাপের মুখে যুদ্ধ করতে আসতো তারাও মুসলিমদের হাতে নিরাপদ ছিল।ইকরিমা রাঃ বলেন বদর যুদ্ধে নবীজি সাঃ নির্দেশ দিয়েছিলেন যদি বনু হাশিমের কেউ তোমাদের সামনে পড়ে যায় তবে হত্যা করবে না। কারণ সে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে আসেনি। তাকে জোর করে আনা হয়েছে। অষ্টম হিজরীতে যখন রাসুল সাঃ মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে এগোচ্ছিলেন।

তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি আসে সে পবিত্র জিহাদকে জাহিলি যুগে আরবদের সাধারণ যুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর কাছে প্রস্তাবনা করে। আপনি যদি সুন্দরী নারী আর লাল উট পেতে চান তবে বনু মুদাল্লাজ গোত্রের উপর আক্রমণ করুন। কেননা তাদের কাছে এ দুটি প্রচুর রয়েছে কিন্তু এখানে যুদ্ধ আর সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। তারপর রাসূল সাঃ বললেন মহান আল্লাহ্ আমাকে ওদের উপর আক্রমণ করতে এ কারণে বারণ করেছেন যে তারা পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। আলী রাঃ বলেন একদিন নবীজির কাছে সাতজন যুদ্ধ বন্দি উপস্থিত করা হয়। তিনি তাদের হত্যার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন ঠিক এমন সময় জিব্রিল আঃ এসে বলেন আল্লাহর রাসূল ছয় জনের ব্যাপারে আপনার নির্দেশ বহাল রাখুন। কিন্তু এই লোককে মুক্ত করে দিন। নবীজি এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন এ লোকটি উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং দানশীল। নবীজি বলেন, আপনি কি নিজের পক্ষ থেকে এই সুপারিশ করেছেন, নাকি এটি আল্লাহর নির্দেশ?জিব্রিল বলেন, মহান আল্লাহই আমাকে এই আদেশ করেছেন। মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদদের ভাষায় গাজওয়া ও সারিয়া শব্দ দুটি এত সাধারন ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে সামান্য ঘটনাকেও গাজওয়া ও সারিয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে। কোন অপরাধীকে বন্দি করতে এক দুজন সাহাবীকে পাঠানো হলে এটাকেও সারিয়া বলা হত। গাজওয়া শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদরা ব্যাপকতার আশ্রয় নিয়েছেন।মোট গাজওয়া ২৩ টি এবং সারিয়া ৪৩ টি।

গাজওয়া

রাসূল এর নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনীর অভিযানে বের হওয়াকে গাজওয়া বলা হয়। তাতে যুদ্ধ হোক বা না হোক, শত্রু বড় হোক বা ছোট হোক, তারা সংখ্যায় বেশি হোক বা কম সংখ্যক হোক।

সারিয়া

সাহাবীদের নেতৃত্বে রাসূলের পাঠানো সৈন্যদলকে সারিয়া বলা হয়। তাতে যুদ্ধ হোক বা না হোক, শত্রু বড় হোক বা ছোট হোক, তারা সংখ্যায় বেশি হোক বা কম সংখ্যক হোক। সারিয়ার সৈন্য সংখ্যা সাধারণত কম হতো। কারণ তাদের কাজ ছিল- শুধু শত্রুর সাথে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে জড়ালে তাদের ভয় দেখানো ও বিভ্রান্ত করা। এখানে জয়-পরাজয়ের কোন বিষয় ছিল না।

গাজওয়ায়ে বদর

নবীজির ইচ্ছা অনুযায়ী এ বছরই বায়তুল মাকদিস এর পরিবর্তে কাবা শরীফকে মুসলিমদের কিবলা নির্ধারণ করা হয়। মদিনা থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরের একটি কুপের নাম বদর। এই কুপের নামে একটি গ্রাম রয়েছে। এখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় তার খুব গুরুত্ব ছিল। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ হয় এখানে। মদিনাতে যখন ইসলামের বসন্ত তখন সেটা মক্কার কাফেরদের খুবই ভাবিয়ে তুলছিল। তারা ভাবছিল এটা কখন বা তাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় কারন তাদের ব্যবসা ছিল শামে। আর এটাই ছিল তাদের ভয় যে, কখন তাদের অহংকার চূর্ন হয়ে যায়। এটা মুসলিমরাও আঁচ করতে পেরেছিলেন। ফলে তারা রাজনৈতিক কৌশল চালিয়ে শামে তাদের ব্যাবসা বন্ধ করতে চাচ্ছিলেন।আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে শামে অর্থ সংগ্রহ এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনার উদ্দেশ্যে মক্কার এক বিশাল বাণিজ্য কাফেলা গিয়েছিল।

কুরাইশদের এই বাণিজ্য কাফেলা ব্যবসা শেষে শাম থেকে অস্ত্র নিয়ে ঘরে ফিরছিল তখন নবীজি সাঃ তা জানতে পেরে দ্বিতীয় হিজরির ১২ ই রমজান ৩১৪ জন মুহাজির ও আনসার সাহাবীকে নিয়ে তাদের মোকাবেলায় বেরিয়ে পড়েন। মুসলিম বাহিনী রাওহা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। কেননা আত্মরক্ষার্থে হামলা ছাড়া মুসলিমদের আর কোন পথ ছিল না।বিষয়টি আবু সুফিয়ান কোনোভাবে টের পেয়ে রাস্তা বাদ দিয়ে সমুদ্রের উপকূল ধরে কাফেলা নিয়ে এগিয়ে যান এবং এক অশ্বারোহীকে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে খবর দেন যেন কুরাইশরা নিজেদের পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে এসে কাফেলাকে বিপদ মুক্ত করে। সংবাদটি জানার সঙ্গে সঙ্গে আবু জেহেলের নেতৃত্বে ৯৫০ জনের এক বিশাল সশস্ত্র বাহিনী মদিনা আক্রমণের জন্য বের হয়। তাদের সঙ্গে ১০০ ঘোড়া ও ৭০০ উট ছিল। কুরাইশের সব বড় বড় নেতারা এই বাহিনীতে অংশ নেয়। রাসূল সাঃ এ বিষয়ে জানতে পেরে তিনি সাহাবীদের সঙ্গে দ্রুত পরামর্শ করেন। আবু বকর ও অন্যান্য সাহাবীগণ এই সময় তাঁদের সবকিছু নবীজির খেদমতে পেশ করেন। উমায়ের ইবনু ওয়াক্কাসকে অল্প বয়সি হওয়ার জন্য, যুদ্ধে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকতে বললে তিনি কান্না শুরু করেন এবং নবীজি তখন তা দেখে তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। আনসারদের থেকে খাজরাজের সরদার সাদ ইবনু উবাদা রাঃ দাঁড়িয়ে বলেন, আল্লাহর কসম, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

এ প্রসঙ্গে সহি বুখারিতে বর্ণনা রয়েছে, তখন মিকদাদ রাঃ দাঁড়িয়ে বলেন, আল্লাহর রাসূল আমরা আপনার ডানে বামে সামনে পেছনে সবদিক থেকে লড়াই করে যাব। এ কথা শুনে রাসুল সাঃ অত্যন্ত খুশি হন এবং সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। তারপরে বদরের প্রান্তরে পৌঁছে জানতে পারেন আবু সুফিয়ান তার কাফেলা নিয়ে অন্য পথ ধরে চলে গেছে। কুরাইশদের কাফেলা অন্য প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেছে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা চলে যাওয়ার পরেও আবু সুফিয়ান কে আবু জেহেল যুদ্ধ স্থগিত না করার কু পরামর্শ দেয়। মুসলমান রা তাদের এ মনোভাব বুঝতে পেরে সামনে অগ্রসর হন এবং দেখতে পান কুরাইশ বাহিনী ময়দানে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে যেটি যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত কেননা পানির উৎসগুলো সেখানে ছিল। আর মুসলিম বাহিনী ময়দানের শুষ্ক আর বালুকাময় জায়গায় অবস্থান নেয়। এখানে চলাফেরা করাও কঠিন।আল্লাহর অনুগ্রহে যুদ্ধের আগের দিন বৃষ্টি হয় ফলে বৃষ্টির পানিতে বালু জমে শক্ত হয়ে যায়। মুসলিম সেনারা তৃপ্তি ভরে পানি পান করে নেন।নিজে নিজ পাত্র

গুলোতে পানি ভরে রাখেন। অন্যদিকে এই বৃষ্টি কাফেরদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। তারা যেখানে অবস্থান করছিল সেখানে আরো পানি জমে কাদা হয়ে যায়। ফলে তাদের জন্য হাঁটাচলা ও কষ্টকর হয়ে যায়। ১৭ই রমজান দ্বিতীয় হিজরীর শুক্রবার দুই পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এ সময় সেনাদের কাতার ঠিক করতে নবীজি সাঃ নিজেই দাঁড়িয়ে যান। মাত্র ৩০০ জন নিরস্ত্র মুসলিম, ১০০০ অস্ত্রসহ সেনার মোকাবেলা করছে। তখন একজন লোক ও যদি এগিয়ে আসে যুদ্ধের ময়দানে,সেটা ও অনেক বড় উপকারের কারন হত।উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন তুমুল যুদ্ধের শুরু হয় তখন ময়দানে হুজায়ফা ও আবু হাসানা রাঃ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত হন। এই সময় তাঁরা রাস্তায় ঘটে যাওয়া ঘটনা বর্ণনা করেন, কাফেররা রাস্তায় আমাদের আটক করেছিল, তখন তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমরা কি মুহাম্মদকে সাহায্য করতে যাচ্ছ? আমরা তা অস্বীকার করি এবং যুদ্ধে অংশ নেব না বলে প্রতিশ্রুতি দিই। নবীজি যখন তাদের এমন প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে তাঁদের বিরত রাখেন। এবং বলেন আমরা সর্ব অবস্থায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব, আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। মুসলিমদের কাতার সোজা করা হলে তখনকার রীতি অনুযায়ী দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মাধ্যমে লড়াই শুরু হয়। কুরাইশদের মধ্য থেকে তিনজন বীর- উতবা ইবনু রাবিআ, শায়বা ইবনু রাবিআ ওয়ালিদ ইবনু উত লড়াইয়ের জন্য সামনে আসে। আর মুসলিমদের থেকে হামজা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব, উবায়দা ইবনু হারিস ও আলী ইবনু আবু তালিব রাঃ আহত হন।কুরাইশদের পক্ষে তিনজন নিহত হন। আর মুসলিমদের মধ্য থেকে শুধু উবায়দা রাঃ আহত হন।আলী রাঃ তখন তাঁকে কাঁধে করে নবীজির কাছে নিয়ে আসেন। তখন তাঁকে নিজের উরুতে শুইয়ে দিয়ে চেহারা থেকে ধুলোবালি নিজ হাতে পরিষ্কার করে দেন। তিনি নবীজীকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহর রাসূল আমি কি শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। নবীজি বলেন না, তুমি নিশ্চয়ই শহীদ এবং আমি নিজেই এর সাক্ষী। নবীজির এই কথা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলতে থাকেন আজ যদি আবু তালিব বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হতো যে আমি হলাম তার কবিতার উপযুক্ত ব্যক্তি। এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন। রাসূল সাঃ তাঁকে নিজে হাতে দাফন করেন। সাহাবীদের মধ্যে বিশেষ এই মর্যাদা কেবল উবায়দা রাঃ এর ভাগ্যেই জুটেছিল।বদরের প্রান্তরে কাফির, মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে অনেক আত্মীয়স্বজন আর তাঁদের কলিজার টুকরাও

তরবারির নিচে এসে গিয়েছিল। আবু বকরের ছেলে তিনি তখনও মুসলিম হননি তিনি যখন যুদ্ধে মাঠে নেমে আসেন তখন আবু বকর রাঃ এর তরবারি তার দিকে এগিয়ে যায়। এদিকে উতবা যখন ছেলে হুজায়ফার সামনে পড়ে, তখন ছেলে হয়েও তিনি পিতার দিকে তরবারি কোষমুক্ত করে এগিয়ে যান।উমারের তরবারি তার আপন মামার উপর দিয়ে যায়।এরপর তুমুল লড়াই শুরু হয়। যুদ্ধ ময়দানে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে রাসুল সাঃ সিজদায় পড়ে যান এবং আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া করতে থাকেন। আবু জেহেল এর অপকর্মে, এমন কোন মুসলমান ছিলেন না যে তার শেষ পরিণতি দেখতে চায়তো না। আনসারদের মধ্যে মুআজ ও মুআওয়িজ নামের দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তারা যখনই তাকে দেখবেন তখনই তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করবেন। অথবা নিজেরা শহীদ হয়ে যাবেন। বদরের যুদ্ধকে সুযোগ মনে করে তাঁরা তাঁদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁরা আবু জাহেলকে কখনো দেখেনি তাই তাকে চিনতেন না। তারা আব্দুর রহমান ইবনে আউফ কে জিজ্ঞাসা করেন আবু জেহেল লোকটা ক? আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ইশারায় তাকে দেখিয়ে দেন। আবু জেহেলকে দেখামাত্র তাঁরা তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়েন।মুহূর্তেই কাফেরদের সরদার আবুজেহেল মাটিতে পড়ে যায়।এ সময় আবুজেহেলের পাশে যুদ্ধ করেছিলেন তার ছেলে ইকরিমা।পরে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। এ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নভাবে রাসূলকে সাহায্য করেছেন। সেই সাহায্যের অংশ হিসেবে আল্লাহ তাআলার আদেশে রাসুল সাঃ একমুঠো মাটি বা পাথর শত্রুদের প্রতি ছুড়ে মারেন এবং সাহাবীদের নির্দেশ দেন একযোগে তোমরা তাদের উপর হামলা চালাও। তাদের সবার চোখে সেটা বিধে যায়। নবীজির নির্দেশে কাফেরদের দিকে সাহাবীরা এগিয়ে যায়।আল্লাহ মুসলিমদের সাথে ফেরেশতাদেরকে সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন। কুরাইশের অনেক বড় বড় নেতারা নিহত হয়। ফলে মুশরিকদের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং তারা পালিয়ে যায়। তখন মুসলিমরা তাদের ধাওয়া করে অনেক জনকে হত্যা এবং বন্দি করে মুসলিমদের মধ্যে ১৪ জন শহীদ হন। এর মধ্যে ছয় জন মুহাজির ও একজন আনসার সাহাবী ছিলেন। অপরদিকে কাফিরদের ৭০ জন নিহত ৭০ জন বন্দী হয়। বন্দীদেরকে নবীজি সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দেন এবং তাদের প্রতি খেয়াল রাখতে বলেন যেন কারোর কোন অসুবিধা না হয়। সাহাবীরা তাদেরকে সেবা যত্ন করেন যথাযথভাবে। খাবার খাওয়াতেন, আরামে রাখতেন, নিজেরা খেজুর খেয়ে দিন পার করতেন। কিন্তু তাদেরকে ভালো

খাবার দিতেন।মুসআব ইবনু উমায়ের রাঃ এর ভাই আব্দুল আজিজ ও যুদ্ধ বন্দি ছিলেন। তিনি বলেন আমাকে যে আনসার সাহাবীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তিনি যখন খাবার নিয়ে আসতেন তখন আমার সামনে রুটি রেখে দিতেন এবং তিনি শুধু খেজুর খেয়ে দিন পার করতেন। পরে রাসুল সাঃ সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে যুদ্ধ বন্দিদের মুক্তি পনের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ৪০০০ দিরহাম করে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। যুদ্ধবন্দীদের মাঝে নবীজির চাচা আব্বাস ছিলেন পরে তিনি মুসলিম হয়ে যান। নবীজির জামাতা আবুল আস যুদ্ধবন্দী ছিলেন। কিন্তু তার কাছে মুক্তি পনের টাকা ছিল না। পরে তিনি তার স্ত্রী জয়নাবের কাছে সংবাদ পাঠান, মুক্তিপণের অর্থ পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। জয়নাব এর গলায় একটি হার ছিল যেটি তার বিয়ের সময় তার মা খাদিজা রাঃ উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন।তিনি মুক্তিপণ হিসেবে সেটা পাঠিয়ে দেন। সেটা দেখে নবীজি সাঃ কেঁদে ফেলেন। তিনি সাহাবীদের বলেন এটি জায়নাবের মায়ের স্মৃতি চিহ্ন যদি তোমরা সম্মত হও তাহলে হারটি তার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। এরপর জায়নাবকে আব্বাস মুক্তির পর মুক্তিপন হিসেবে মদিনায় পাঠিয়ে দিবেন,এই শর্তে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। নবীজির জামাতা আবুল আস মুক্তি লাভের পর পুনরায় মক্কায় ফিরে তাঁর স্ত্রী জয়নবকে কে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। তিনি বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তারপর শাম থেকে ব্যবসা পণ্য নিয়ে আসার সময় মুসলিমদের হাতে তিনি আবার বন্দী হন।দ্বিতীয়বারের মতো মুক্তি পেয়ে তিনি মক্কায় চলে যান এবং সবার মাল তাদের বুঝিয়ে মুসলমান হয়ে যান। যুদ্ধ বন্দীদের পড়ার মতো কোনো কাপড় ছিল না। রাসুল সাঃ তাদের কাপড়ের ব্যবস্থা করেন। যেসব বন্দীরা মুক্তিপণ আদায় করতে সক্ষম ছিল না তাদেরকে ১০ জন মুসলিম শিশুকে লেখা পড়া শেখানোর শর্তে মুক্তি দিয়ে দেয়া হয়। এভাবেই জায়েদ ইবনে সাবিত লেখাপড়া শিখেছিলেন। বদরের যুদ্ধের বিজয় ধরেই মুসলিমরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

গাজওয়ায়ে উহুদ

মদিনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরের একটি পাহাড়ের নাম উহুদ। উহুদের যুদ্ধ তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে সংগঠিত হয় তবে তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বদর যুদ্ধের পরাজয় এবং গ্লানি ছিল এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট। সে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তারা প্রতিহিংসা

থেকে যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ৩ হাজার সেনার বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। এর মধ্যে ৭০০ বর্ম, ২০০ ঘোড়া, তিন হাজার উট ছিল।১৪ জন মহিলাকে ও তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। নবীজির চাচা আব্বাস রাঃ মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরও তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন। এবং এই ঘটনা জানার পর তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। বিস্তারিত সংবাদসহ নবীজির কাছে তিনি একজন দূত পাঠিয়ে দেন। নবীজি এ কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোককে এ অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান। তারা ফিরে এসে সংবাদ দেন যে তারা মদিনার উপকণ্ঠে এসে গেছে। যেহেতু মদিনা আক্রমণের আশঙ্কা ছিল তাই শহরে চারিদিকে পাহাড়ের ব্যবস্থা করা হয়। সকালে নবীজির ১০০০ সেনার এক বাহিনী নিয়ে মদিনার বাইরে চলে আসে। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও ৩০০ মুনাফিক বাহিনী ফিরে আসে। মুসলিমদের সংখ্যা তখন কমে দাঁড়ায় ৭০০ তে। মদিনা থেকে বেরোনোর পর যখন মুজাহিদদের চূড়ান্ত বাছাই করা হয় তখন অল্প বয়সি কিছু কিশোর কে ও প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। রাফি ইবনু খাদিজকে যখন বলা হয় তোমার বয়স কম তুমি মদিনায় ফিরে যাও তখন তিনি পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ান, যেন তাকে লম্বা ও উঁচু মনে করা হয় এবং প্রচন্ড আগ্রহের দরুন শেষ পর্যন্ত যুক্ত করা হয়। সামুরা ইবনু জুনদুব রাফি ইবনু খাদিজের সমবয়সী ছিল।এই ঘটনা দেখে তখন তিনি বললেন আমি তো রাফিকে মল্ল যুদ্ধে পরাস্ত করে থাকি। তাকে যদি যুদ্ধের জন্য মনোনীত করা হয় তাহলে তো আমাকে আরো আগে নেওয়া উচিত। তার কথা মতো রাফি ও সামুরাকে কুস্তি লাগিয়ে দেওয়া হয়। সামিরা খাদিজকে পরাজিত করেন। পরে তাকেও যুদ্ধের অংশ হিসেবে যুক্ত করা হয়। উহুদ পাহাড় কে পেছনে রেখে মুজাহিদদের বিন্যাস করে কাতার বন্দি করে রাসূল সাঃ দাঁড় করান। কারণ এ দিক দিয়ে শত্রুদের এগিয়ে আসার আশঙ্কা ছিল। এ কৌশল ঝুঁকিপূর্ণ ও অসুবিধাজনক দুটোই ছিল। উহুদের পেছনদিকে এক জায়গাতে হামলার আশঙ্কা ছিল নবীজি সেখানে ৫০ জনের এক তীরন্দাজ বাহিনীকে পাহাড়ায় দাঁড় করিয়ে সর্ব অবস্থায় অটল থাকার নির্দেশ দেন। এরপর যুদ্ধ শুরু হয়। কিছুক্ষন যুদ্ধের পর কুরাইশরা পিছু হটতে শুরু করে।তারা যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ের বেশে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু বিপত্তি বাধে নবীজি যে ৫০ জনকে পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন তারা মুসলমানদের বিজয় হয়েছে মনে করে সেখান থেকে নিশ্চিন্তে চলে আসেন। তাদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের বারবার নিষেধ করছিলেন কিন্তু তারা তাদের নেতার

কথা মানেননি। এ জায়গাটি ফাঁকা দেখে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ তিনি তখনও মুসলমান হননি এবং কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন, পেছন থেকে আচমকা আক্রমণ করে যুদ্ধের দৃশ্য পাল্টে দেন। ইবনু জুবায়ের সহ আরো কয়েকজন সাহাবী প্রাণপণ লড়ে ও শাহাদাত বরণ করেন। এরপর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ তার পুরো বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধের অবস্থা এমন ভয়াবহ যে মুসলমান মুশরিক সবাই একসাথে মিলেমিশে যায়। তখন মুসলমানদের হাতে মুসলমানরা নিহত হতে থাকেন। মুসআব ইবনে উমাইর এ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর চেহারার সাথে নবীজির চেহারার অনেক মিল ছিল। পরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে রাসূল সাঃ শহীদ হয়েছেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে মুশরিকদের কেউ কেউ ঘোষণা দেন মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন। সাহাবীদের এ ঘোষণা শুনে মনোবল ভেঙ্গে যায়। অনেক বড় বড় সাহাবীরা হতাশ হয়ে যান। কাআব ইবনু মালিক প্রথমে তাঁকে দেখতে পান এবং চিৎকার দিয়ে ওঠেন। মুবারক হো, নবীজি নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। তখন সবাই নবীজির কাছে দৌড়ে আসতে থাকেন। এ সময় কাফিররা এদিকে মনোনিবেশ করে কয়েকজন নবীজির উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তারপরে নবীজির উপর কঠোর আগমন করতে গেলে, তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, কে আছ এমন যে আমার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তখন জিয়াদ ইবনু সাকান নিজের চার সঙ্গী সহ এগিয়ে আসেন। শেষ পর্যন্ত লড়াই করে তারা শহীদ হন। জিয়াদ যখন আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান, তখন রাসূল সাঃ বলেন তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসো। সাহাবীরা তাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন তখনও তাঁর প্রাণ বাকি ছিল। জিয়াদ নবীজির পায়ের উপর নিজের মুখ রাখেন এবং এই অবস্থাতে শাহাদত লাভ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু কুমাইয়া সারি ভেদ করে সামনে গিয়ে নবীজির মুখে তরবারি দিয়ে আঘাত করে। ফলে নবীর মাথায় পরিহিত শিরস্ত্রানের দুটি কড়া মুখ ভেদ করে ঢুকে যায় এবং একটি দাঁত শহীদ হয়। তখন আবু বকর রাঃ কড়া দুটি ক্ষতস্থান থেকে উঠাতে এগিয়ে এলে, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাঃ বলেন, আল্লাহর কসম এই খিদমতটি আমাকে করার সুযোগ দিন। তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে হাত না লাগিয়ে নিজের মুখ দিয়ে সে কড়া দুটিতে টান দেন এতে করে একটি কড়া বেরিয়ে আসলেও তাঁর একটি দাঁত পড়ে যায়।এ দৃশ্য দেখে আবু বকর দ্বিতীয় কড়াটি বের করতে গেলে আবারও কসম দিয়ে তিনি বিরত রাখেন এবং নিজেই তাতে মুখ লাগিয়ে টান দেন এবারও তারা আরেকটি দাঁড কড়ার সাথে উঠে আসে। এ সময় কাফেরদের একটি গর্তে রাসূল সাঃ পড়ে

যান। কাফিরদের আক্রমনের মুখে এ দৃশ্য দেখে , তাঁকে চারদিক থেকে সাহাবীরা ঢাল হিসেবে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকেন। আবু দুজনা নিজেকে নবীজির ঢাল বানিয়ে রেখে কাফেরদের তীরগুলো তাঁর শরীরের ভিতরে হাঁসিমুখে সহ্য করতে থাকেন। যুদ্ধ শেষে হিসাব করে দেখা যায় তালহার শরীরেই ৭০ টিরও বেশি তীরের আঘাত রয়েছে। আবু তালহা একটি ঢালের মাধ্যমে নবীজিকে হেফাজত করছিলেন। নবীজি যখনই ধার উচিয়ে সেনাদের দিকে তাকাতেন তখন আবু তালহা বলতেন আল্লাহর রাসূল আপনি মাথা উঠাবেন না শত্রুরা নিপাত যাক আপনার শরীরে যাতে কোন তীর না লাগে। এজন্য আপনার আগে আমার বুক প্রস্তুত রয়েছে। নবীজিকে সবাই জিজ্ঞেস করেন আল্লাহর রাসূল যুদ্ধে আমি যদি নিহত হয়, তাহলে আমার অবস্থান কোথায় হবে। তিনি বললেন জান্নাতে। তাঁর হাতে তখন কয়েকটি খেজুর ছিল। তিনি খাচ্ছেন, এই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে যান এবং লড়াই করে শহীদ হন।এদিকে কুরাইশরা নির্দয়ভাবে নবীজির   উপর তীর নিক্ষেপ করছিল।আর নবীজির মুখ থেকে তখনো রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। রহমতের নবী তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছে নিচ্ছিলেন। নবীজি বলেন যদি রক্তের একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়তো তাহলে সবার উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসত। নবীজির দৃঢ় অবস্থানে কাফিররা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে যায়। মুসলিমদের পক্ষে ৭০ জন শহীদ হয় আর কাফেরদের পক্ষে ২২ জন নিহত হয়।

গাজওয়ায়ে খন্দক

বদর, উহুদের পর মক্কা ও মদিনার সবাই মিলে মুসলিমদেরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার জন্য একজোট হয়ে যায়। তাদের সম্মিলিত বাহিনী একযোগে মদিনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার।রাসূল সাঃ যখন তাদের এগিয়ে আসার সংবাদ শোনেন তখন তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। সালমান ফারসী নবীজিকে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন এবং তিনি পরিখা খননের পরামর্শ দেন। নবীজি তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তিন হাজার সাহাবীকে নিয়ে পরিখা খননের কাজে লেগে যান। মাত্র ছয় দিনে পাঁচ গজ গভীর পরিখা খনন এর কাজ সম্পন্ন হয়। পরিখা খনন করতে গিয়ে একটি বিশাল আকৃতির পাথর খন্ড বের হয়। সবাই মিলে এটা সরাতে ব্যর্থ হলেও নবীজি তাঁর হাত দিয়ে এমন ভাবে

আঘাত করেন যে পাথরটা খন্ড বিখন্ড হয়ে যায়। এ দিকে কাফিররা এসে মদিনা অবরোধ করে ফেলে এবং সেখানে মুসলমানেরা ১৫ দিনের জন্য অবরুদ্ধ থাকেন। ইয়াহুদিদের শেষ গোত্র বনু কুরায়যাও চুক্তি ভঙ্গ করে সেই সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে চরম অস্থিতিশীল অবস্থায় সৃষ্টি করে। মুসলমানরা তিন দিন অনাহারে কাটান। সাহাবীরা ক্ষুধার যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে নিজেদের পেট উন্মুক্ত করে দেখান যে সবাই পেটে পাথার বেঁধে আছে। নবীজি নিজের উদর উন্মুক্ত করে দেখান তাঁর পেটে দুটি পাথর বাধা রয়েছে। পরিখা পার না হতে পেরে মুসলিমদের উপর তারা তীর নিক্ষেপ শুরু করে।অবস্থা এমন সংকটাপন্ন ছিল যে নবীজির চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যায়। অবশেষে মুসলমানদের উপর আল্লাহর সাহায্য আসে। কাফিরদের উপর এমন ঝড়ো হওয়া বয়ে যায় যে তাদের তাবুর খুঁটি পর্যন্ত উড়ে যায় এবং চুলায় থাকা ডেকচি উল্টে পড়ে।এ অবস্থা দেখে তারা হতবম্ব হয়ে যায়। এ সময় নাইম ইবনু মাসউদ এমন এক কৌশল অবলম্বন করেন এতে করে কাফেরদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় তখন পালানো ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না। ফলে তারা পরাজয় নিয়ে ময়দান খালি করে ফিরে যায়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

হুদায়বিয়া মক্কা থেকে এক মন্জিল দূরের একটি কুপের নাম। এই নামের অনুসারে এলাকার নাম হুদাইবিয়া করা হয়। ষষ্ঠ হিজরির জিলকদে রাসুল সাঃ উমরা করার নিয়তে ইহরাম বাঁধেন। তার সঙ্গে ১৪ বা ১৫ শত সাহাবীর বিরাট জামাত রওনা হয়। হুদায়বিয়া পৌঁছানোর পর নবীজি উসমান রাঃ কে মক্কায় পাঠিয়ে কুরাইশদের কাছে এ বার্তা পৌঁছাতে পাঠান যে তিনি এবার শুধু বায়তুল্লাহ জিয়ারত ও উমরা পালনের জন্য এসেছেন। অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাঁর নেই। অপরদিকে চারিদিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে উসমান রাঃ কে মুশরিকরা বন্দী করে হত্যা করেছে। নবীজির কাছে যখন এই সংবাদ আসে তখন তিনি বাবলা গাছের নিচে বসে সাহাবীদের কাছ থেকে জিহাদের বায়আত নেন।এটিকে বায়আতে রিজওয়ান বলা হয়।পরে জানা যায় হত্যার খবরটি মিথ্যা ছিল।মূলত কুরাইশরা মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধির বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে।এবং কিছু শর্তের বিনিময়ে হুদাইবিয়ার চুক্তি নির্ধারিত হয়। এটিই হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। মূলত এ চুক্তি মক্কা বিজয়ের ই একটি অংশ ছিল।

বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে নবীজির চিঠি

হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে দাওয়াতের পথটা অনেকটা মসৃণ হয়। তখন রাসুল সত্যের আহ্বান জানানোর জন্য বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে চিঠি পাঠাতে লাগলেন। এ উদ্দেশ্যে আমর ইবনু উমাইয়াকে হাবশার বাদশাহ আসহামা নাজাশির কাছে পাঠান। তিনি চিঠি পেয়ে সিংহাসন থেকে বসে পড়েন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলের যুগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। দাহইয়া কালবি রাঃ কে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেন। কিন্তু প্রজাদের ভয়ে তিনি ইসলাম গ্রহন থেকে বিরত থাকেন, সিংহাসনচ্যুত হওয়ার ভয়ে।আব্দুল্লাহ ইবনু হুজাইফাকে পারস্যের সম্রাট খসরূ পারভেজ এর কাছে পাঠান। নবীজির চিঠির সঙ্গে তিনি অত্যন্ত খারাপ আচরণ করেন। চিঠি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেন। নবীজির কাছে এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি তার জন্য বদ দোয়া করেন, আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকে এমন ভাবে টুকরো টুকরো করে দিন যেভাবে সে আমার চিঠি টুকরো টুকরো করেছে। নবীজির দুআা বিফল হয়নি। কিছুদিন পরে তিনি তার পুত্রের হাতে নিহত হন।এ ছাড়া হাতিব ইবনু আবি বালতাআা রাঃ কে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকিসের কাছে পাঠান। তিনি অত্যন্ত উত্তম আচরণ করেন এবং নবীজির জন্য কিছু উপহার পাঠান এর মধ্যে মারিয়া কিবতিয়া নামে একজন দাসী ছিলেন।আর দুলদুল নামে একটি খচ্চর ছিল। আমর ইবনুল আস রাঃ কে চিঠিসহ আম্মানের বাদশাহ জাইফার ও আব্দুল্লাহর কাছে পাঠান।তাঁরা উভয়ে মুসলমান হন।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের ইসলাম গ্রহন

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে অসাধারণ বিরত্ব দেখিয়ে আসছিলেন। বিশেষত খন্দক যুদ্ধে তার কারনেই আবার কাফিররা সংগঠিত হয়ে যুদ্ধ করতে পেরেছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে তিনি নিজের থেকে ইসলাম গ্রহণের জন্য মক্কা থেকে মদিনায় যাত্রা করেন।পথে আমর ইবনুল আসের সাথে সাক্ষাৎ হলে জানতে পারেন তিনি ও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাচ্ছেন। পরে তাঁরা দুজন ই মদীনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

খায়বার যুদ্ধ

বনু নাজির সম্প্রদায় খাইবারে গিয়ে বসতি স্থাপন করলে তখন সেটা ইয়াহুদীদের কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হয়। লোকদের ইসলামের বিরুদ্ধে তারা উত্তেজিত করে তুলছিল। তখন রাসুল সাঃ ৪০০ পদাতিক এবং ২০০ অশ্বারোহী সেনা বাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবেলার জন্য উপস্থিত হন। উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধের শেষে আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করেন। খায়বারের যুদ্ধে আলী রাঃ একাই হাত দিয়ে দুর্গফটক উপড়ে ফেলেন। অথচ কথিত আছে ফটক একসঙ্গে ৭০ জন লোকও নাড়াতে পারতো না। কেউ কেউ বলেছেন আলী রাঃ যুদ্ধে এই ফটকটি তাঁর হাতের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

কাজা উমরা আদায়

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানরা যে উমরা আদায় করতে পারেনি ।ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে সেই প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি অনুযায়ী রাসূল সাঃ তার সাহাবীদের নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হন এবং চুক্তির সব শর্ত মেনে উমরা পালন শেষে আবার মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। কাফেরদের সঙ্গে সে সময় চুক্তি হয়েছিল মুসলমানরা আগামী বছর উমরা আদায় করবে এবং তিন দিনের বেশি সময় মক্কায় থাকবে না।

মক্কা বিজয়

হু্ুায়বিয়ার সন্ধিতে যেসব চুক্তি নামা লেখা ছিল মুসলমানরা তা একনিষ্ঠ ভাবে পালন করেন। কিন্তু অষ্টম হিজরিতে কুরাইশরা সেই সন্ধি ভঙ্গ করে বসে। তখন রাসূল সাঃ একজন দূত পাঠিয়ে চুক্তি আবার নতুন করে করার জন্য কয়েকটি শর্ত দেন এবং শেষের দিকে লিখে দেন এই শর্তগুলো তাদের মনঃপুত না হলে সন্ধি ভেঙ্গে গেছে বলে মনে করতে হবে। কুরাইশরা সন্ধি ভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরপর রাসুল সাঃ আসরের নামাজের পর দশ হাজার সাহাবীর এক বিশাল বাহিনী সমেত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি মদিনা থেকে রওনা হন।কুদায়বিয়া নামক স্থানে মাগরিবের সময় হলে সেখানে সবাই ইফতার করেন।খালিদ ইবনুল ওয়ালিদসহ মুসলিম বাহিনীর একটি অংশসহ মক্কায় প্রবেশের জন্য পাঠান এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, যে কেউ তাদের সাথে সংঘর্ষে না জড়ালে, তারাও যেন তাদের তরবারি উন্মুক্ত না করে। এদিকে রাসূল সাঃ অপর প্রান্ত দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং সাধারন ঘোষণা দেন যে, যে মসজিদে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ, যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সে ও নিরাপদ। কিন্তু তারা সবাই এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা বিজয়ের পর মদিনায় পৌঁছে অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেন। ২০ রমজান শুক্রবার রাসুল সাঃ তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। তখনও কাবার আশেপাশে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। এ সময় নবীজির হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল।তিনি মূর্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাঠ দ্বারা ইঙ্গিত করতেন আর মূর্তি মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। তখন তিনি বলতেন

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَطِلُ إِنَّ الْبَطِلَ زَهُوقًا(

সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।(সুরা বনি ইসরাইল:)

রাসুল সাঃ কাবার চাবিরক্ষক উসমান ইবনু তালহা সাইবির কাছ থেকে চাবি নিয়ে কাবার ভিতরে প্রবেশ করেন। সেখানে নামাজ শেষে তিনি কি নির্দেশ দেন তা শোনার জন্য সবাই উৎকণ্ঠ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। রাসূল সাঃ কুরাইশদের সম্বোধন করে

বলেন, তোমরা সব দিক থেকে স্বাধীন ও নিরাপদ। তারপর তিনি কাবা ঘরের চাবি তাদের ফেরত দিয়ে দেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছিল সবগুলোর নেতৃত্বে প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করেন আবু সুফিয়ান। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মুসলিম বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের সময় তিনি সাহাবীদের হাতে আটকা পড়েন। নবীজির খিদমতে তাকে আনা হলে নবীজি তাকে ক্ষমা করে দেন।নবীজির ব্যাবহারে মুগ্ধ হয়ে তিনি তখনই মুসলমান হয়ে যান।

হুনাইন যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের পর সবাই দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ইসলামের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হওয়া সত্বেও অনেকে ইসলামের প্রবেশ করতে পারছিলেন না। এ কারণে তারা দলে দলে তখন ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। কিন্তু হওয়াজিন ও সাকিফ গোত্র দুটি আত্মসম্মানবোধের জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মক্কার দিকে এগিয়ে যায়।রাসুল সাঃ এক বিশাল বাহিনী তাদের মোকাবেলায় প্রস্তুত করেন। ১০০০০ ছিল আনসার আর মুহাজির, আর দুই হাজার নওমুসলিম। মুসলিম বাহিনীর এটি ছিল সবচেয়ে বড় সংখ্যা। তারা যখন হুনাইন প্রান্তরে পৌঁছায় তখন শত্রুরা তাদের উপরে অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। এ সম্পর্কে কুরআনে ইঙ্গিত আছে যে মুসলিমরা তখন নিজেদের চিরাচরিত অভ্যাস এর বিপরীতে নিজেদের সংখ্যা এবং সরন্জাম দেখে গর্ব করছিলেন।এমনকি আবু বকরের মুখ থেকে এ ধরনের কথা উচ্চারিত হয়েছিল যে আজ আমরা পরাজিত হতে পারি না। এজন্য আল্লাহ সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা যায় , প্রাথমিক পরাজয় দান করেন। বদর যুদ্ধে নিরস্ত্র সত্বে ও আল্লাহ বিজয় দান করেছিলেন আর হুনায়ন যুদ্ধে বিপুল লোক থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক পরাজয় হয়। রাসূল তখন দুটি বর্ম পরে দুলদুলে আরোহন করা অবস্থায় ছিলেন।আব্বাস রাঃ মুসলিমদের একত্রিত থাকার জন্য আহ্বান জানান।দুদলের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ লেগে যায়। রাসুল সাঃ একমুঠ মাটি নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ছুরে মারেন।আল্লাহর রহমতে তা প্রত্যেক সেনার চোখে গিয়ে পড়ে।শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়ে,ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের মাত্র চারজন আর এবং শত্রুপক্ষের ৭০ জন নিহত হয়।

তায়েফযুদ্ধ

তায়েফ ছিল বনু হাওয়াজিন ও বনু সাকিফের কেন্দ্র।১৮ দিন অবরুদ্ধ থাকার পরেও বিজয় আসেনি। অবরোধ তুলে জিইররানা নামক স্থানে পৌঁছালে তায়েফের হাওয়াজিন এর প্রতিনিধি দল নবীজির খেদমতে এসে আবেদন করে মুসলমানদের হাতে তাদের যে সকল লোক হুনাইনযুদ্ধের সময় থেকে বন্দী রয়েছে, তাদের যেন মুক্তি দেয়া হয়।নবীজি তাদের মুক্ত করে দেন। এরপর তায়েফ থেকে মদিনায় ফিরে তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

তাবুকযুদ্ধ

তায়েফ থেকে মদিনায় ফিরে নবম হিজরির মাঝামাঝি পর্যন্ত রাসূল মদিনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সংবাদ পান মুতার যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকরা তাবুকে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করছে। রোমানদের যুদ্ধের কথা শুনে রাসূল ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু তখন দুর্ভিক্ষ চলার কারণে মানুষ প্রচন্ড অভাবে দিন পার করছিল, আবার তখন প্রচন্ড গরমও ছিল। কিন্তু সাহাবীরা ছিলেন দ্বীনের জন্যই উৎসর্গকারী। তাই তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। আবু বকর রাঃ তাঁর ঘরের সব জিনিসপত্র নবীজির খেদমতে হাজির করেন।এরপর ৩০ হাজার সাহাবীর এক বিশাল কাফেলা নিয়ে রাসুল তাবুকে রওনা দেন। এ যুদ্ধের সময়ে নবীজি তার উটনি হারিয়ে ফেলেন এবং জিব্রাইলের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দেন যে তার উটনি অমুক জায়গায় একটি গাছের সঙ্গে আটকা আছে। পরে তিনি সেখানেই সেটি পান। নবীজি তাবুকে পরে ২০ দিন অবস্থান করেন। কিন্তু কেউ মোকাবেলায় আসেনি। তারপর তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। এটাই ছিল নবীজির সর্বশেষ গাজওয়া বা যুদ্ধ অভিযান। নবম হিজরীর রমজানে তিনি বাহিনী নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীর জিলকদ মাসে নবীজি সাঃ আবু বকর রাঃ কে হজের আমি নির্ধারণ করেন।

১০ হিজরির ২৫ জিলকদ সোমবার রাসুল সাঃ হজ করতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বিশাল জামাআত তাঁর সঙ্গী হয় , এ সংখ্যা ছিল এক লাখ এর চেয়ে বেশি।

রাসূল উটে করে হজ সম্পন্ন করছিলেন এবং মুসলিমদের হজের নিয়ম কানুন ব্যাখ্যা করলেন। অতঃপর তিনি যখন আরাফাতের ময়দানে তখন আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন,

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বিনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বিন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।(সূরা মায়েদা)

সাহাবীরা এ আয়াত শুনে কাঁদতে শুরু করে। তারা বুঝতে পারে রাসূল সাঃ আর তাঁদের মাঝে বেশিদিন থাকবেন না। উমারকে জিজ্ঞাসা করা হল কেন তিনি কাঁদছেন, তিনি উত্তর দেন যখন কোন কিছুর উত্থান ঘটে আর সেটা পূর্ণতা লাভ করে এরপর তার কেবল পতনী সম্ভব।তিনি বলতে চাচ্ছিলেন ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এরপর রাসুল সাঃ কালো পাথর স্পর্শ করে চুমু খেলেন, তাওয়াফ শুরু করলেন। প্রথম তিনবার তাওয়াফ ছিল দ্রুতগতির আর পরের চারবার ছিল সাধারণ গতিতে। এরপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন

আর স্মরণ করো যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলন কেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং তোমরা মাকামে ইব্রাহিমকে সালাতের স্থান রূপে গ্রহণ করো, আর আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রূকুকারী ও সিজদা কারীর জন্য পবিত্র করো। (সূরা বাকারা)

এরপর তিনি মাকামে ইব্রাহিমকে তাঁর আর কাবার মাঝে রেখে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। তারপর আবার কাল পাথর স্পর্শ করে চুমু খেলেন। এরপর পাঠ করলেন

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং যে বায়তুল্লাহর হজ করবে কিংবা উমরা করবে তার কোন অপরাধ হবে না যে সে এগুলো তাওয়াফ করবে আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কল্যাণ করবে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ শোকর কারী সর্বজ্ঞ(সূরা বাকারা)

এরপর রাসুল সাঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাই করলেন সাতবার। এবং উরানাহ উপত্যকায় এসে সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন যেটা বিদায় হজের ভাষণ নামে পরিচিত।

বিদায় হজের ভাষণ

রাসুল সাঃ এর এটিই ছিল শেষ ভাষন। দীর্ঘ এ ভাষন ছিল মুসলিমদের জন্য উপদেশে ভরপুর।নীচে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো।নবিজি বলেন,

লোকসকল, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, যাতে আমি তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয় বর্ণনা করতে পারি। আমি জানি না। আগামী বছর আমি তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারব কি না।

নবিজি আরও বলেন,
মুসলিমদের জানমাল, ইজ্জত-সম্মান কিয়ামত পর্যন্ত এমনভাবে পবিত্র ও সম্মানিত, যেভাবে আজকের এ দিন (আরাফাতের দিন), এ মাস (জিলহজ মাস) এবং এ শহর (পবিত্র মক্কা) তোমাদের কাছে পবিত্র- সম্মানিত। এ জন্য কারও কাছে যদি অন্য কারও আমানত থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই সেটা আদায় করতে হবে।তিনি আরও বলেন,

হে লোকেরা, তোমাদের স্ত্রীদের তোমাদের ওপর কিছু অধিকার রয়েছে, যেভাবে স্ত্রীদের ওপর তোমাদের কিছু আধিকার রয়েছে। সকল মুসলমান একে অপরের ভাই। কারও জন্য তার ভাইয়ের সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া নেওয়া বৈধ নয়।

আমার পরে তোমরা আবারও কাফির হয়ে যেয়ো না। একে অপরকে হত্যা করো না। আমার অবর্তমানে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব কুরআন রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি কুরআনের যাবতীয় বিধান শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।

নবিজি আরও বলেন,

হে লোকসকল, তোমাদের রব একজন, তোমাদের আদি পিতা একজন; তোমরা সবাই আদম আঃ এর সন্তান; আর আদম আঃ মাটির সৃষ্টি। তোমাদের সে-ই সবচেয়ে অধিক সম্মানী, যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু। (মনে রেখো,) কোনো আরব খোদাভীতি ছাড়া কোনো অনারবের ওপর শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

খুতবা শেষে রাসুল সাঃ সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে কি বলবে?
সাহাবীরা উত্তর দিলেন, "আমরা সাক্ষ্য দেবো, নিশ্চয়ই আপনি আপনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের আন্তরিক উপদেশ দিয়েছেন।' এরপর আল্লাহর রাসূল আকাশের দিকে আঙুল তুললেন, এরপর আবার মানুষের দিকে আঙুল দেখালেন, এরকম কয়েকবার করলেন আর বলতে থাকলেন,

'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো। হে আল্লাহ। তুমি সাক্ষী থেকো!'

রাসুল সাঃ খুতবায় একটি কথা স্পষ্ট করে বলে গেছেন, মুসলমানরা যতদিন কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন তাদেরকে কোন কিছুই পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।

জীবনসায়াহ্নে রাসূল

দ্বীন ইসলামের পূর্ণতা পেয়েছে। আল্লাহ রাসুলের উপর তিনি যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। মুসলিমদের জীবন কিভাবে পরিচালিত হবে মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের মাধ্যমে তা দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। রাসূল সাঃ যে দুনিয়া ত্যাগ করবেন আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা সেটা বেশ কিছু আয়াতে আগে থেকেই নাযিল করেন।

আল্লাহ বলেন,"আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। আপনার রব শীঘ্রই আপনাকে এমন কিছু দেবেন যে আপনি খুশি হবেন।" (সূরা আদ দুহা,)

"নিশ্চয়ই আপনারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের রবের সামনে বাকবিতণ্ডা করবে।” (সূরা যুমার,)

"আপনার আগেও কোনো মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আম্বিয়া,)

আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার আগে নিশ্চয়ই অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি তিনি মারা যান অথবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।" (সূরা আলে-ইমরান,)

"ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমণ্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" (সূরা আর রহমান)

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সূরা মায়েদা, ৫: ৩)

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী(সূরা আন নাসর)

সফর মাসের ঘটনা। একদিন মাঝ রাতে রাসুল সাঃ আবু মুওয়াইহিবাকে ডেকে বললেন আমাকে বাক্কির অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ করা হয়েছে। চলো আমার সাথে। তিনি ছিলেন রাসুল সাঃ এর আজাদকৃত দাস। বাক্কি হল মদিনার কবরস্থান, সেখানে তাঁদেরকে দাফন করা হয়েছে যারা রাসুলের সাথে যুদ্ধ করেছেন ইসলামের জন্য জীবন দিয়েছেন। গভীর রাত, রাসুল সাঃ বাক্কিতে গেলেন এবং দোয়া করলেন

হে কবরবাসী তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা যে অবস্থায় আছো সেটা জিবীত অবস্থার চাইতে ভাল। তোমরা সুখী হও। আধার রাতের মত ধেয়ে আসছে ফিৎনা-ফাসাদ। একটার পিছনে আরেকটা। আর প্রথমটার চাইতে পরেরটা ভয়াবহ। এর পর রাসূল সাঃ আবু মুওয়ায়হিবার দিকে তাকিয়ে বললেন,আমাকে দুইয়ের মাঝে একটি বাছাই করতে বলা হয়েছে, আমি দুনিয়ার হয় সমস্ত রত্ন ভান্ডার আর তার চাবি নিয়ে থাকবো অথবা জান্নাতে যাব অথবা আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ।আবু মুওয়ায়হিবা বললেন আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। আপনি দুনিয়ার রত্ন ভান্ডার, শেষ পর্যন্ত দুনিয়াতে থেকে, তারপর জান্নাত এই সুযোগটাই বেছে নিন। রাসুল সাঃ বললেন, আল্লাহর কসম আমি আমার রবের সাথে মিলিত হওয়া এবং জান্নাতকে বেছে নিয়েছি।সেখান থেকে ফিরে এসে রাসুলুল্লাহ সাঃ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

বিদায় এর সন্ধিক্ষণে রাসূল

আল্লাহর রাসূল সাঃ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। পাশেই বসা আয়শা রাঃ। প্রচন্ড মাথা ব্যথায় কাতর হয়ে আইশা বলছেন! উফ ব্যথায় মরে যাচ্ছি। রাসূল সাঃ তখন রসিকতা করে

বললেন, যদি তাই হয় আমি তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারব, তোমার জন্য দোয়া করতে পারব। আয়শা রাঃ তখন অভিমান নিয়ে বললেন, হ্যাঁ আপনি তো সেটাই চান আমি মরে গেলে তো আপনি অন্য স্ত্রীদের কাছে যেতে পারবেন। রাসূলের তখন প্রচন্ড জ্বর ছিল। এক সাহাবী মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার তো প্রচন্ড জ্বর। রাসূল তখন বললেন হ্যাঁ আমরা নবীরা অন্য যে কারো চেয়ে দ্বিগুণ কষ্ট ভোগ করে থাকি। আল্লাহ যাদের বেশি ভালোবাসেন, তাদের পরীক্ষাগুলো ও বেশি কঠিন। কষ্ট গুলো ও বেশি তীব্র। আর পুরস্কার ও অন্যদের চাইতে বেশি। জীবনের শেষ দিনগুলো রাসূল সাঃ আয়েশা রাঃ এর ঘরে কাটিয়েছেন। এতে তাঁর অন্যান্য স্ত্রীরা সম্মত ছিলেন। শেষ সময়ে তিনি এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে তাঁকে চলাফেরা করতে হতো। জীবন সায়াহ্নে রাসুল সাঃ।তবুও তাঁর উম্মাহর মানুষদের নিয়ে ফিকির কমেনি এতটুকু ও।তিনি বললেন আমার গায়ে সাত বালতি পানি ঢেলে দাও। যেন তাঁর শরীরের তাপমাত্রা কমে আসে এবং তিনি মসজিদে যেতে পারেন। তিনি একা হাঁটতে পারছিলেন না তাই অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে তাঁকে মসজিদে যেতে হল। আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলার প্রশংসা করে রাসূল সাঃ সালাত পড়লেন। মাগফিরাতের দোয়া করলেন। উহুদের শহীদদের কথা স্মরণ করলেন। তারপর মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে বললেন,

''মুহাজিররা শোনো তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু আনসারদের সংখ্যা কমে আসছে, শুরুর দিকে তারাই আমাকে সাহায্য করেছে, তোমরা তাদের প্রতি সদয় হবে কাজে, তাদের মধ্যে যারা উত্তম তাদের সাথে ভালো আচরণ করো, আর যারা ভুল ত্রুটি করে তাদের ক্ষমা করে দিও,,।

এরপর রাসুল সাঃ বলেন আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন একজন বান্দা আছে যাঁকে দুনিয়ার শান শওকত অথবা আল্লাহর কাছে যা আছে এই দুইয়ের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। আবু বকর রাঃ ছাড়া এ কথার অর্থ আর কেউ বুঝলো না। আবু বকর রাঃ বুঝতে পারলেন যে, রাসুল সাঃ তাঁর নিজের কথা বলছেন। তাই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন
“”আমার আর আমাদের সন্তানরা আপনার জন্য কুরবান হয়ে যাক “”

রাসূল সাঃ তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে আবু বকরের উচ্চ মর্যাদা ও প্রশংসা করেছেন। তাঁর প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ, কিন্তু দুনিয়াতে কাউকে রাসুলের বন্ধু হিসেবে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকলে তিনি আবু বকর রাঃ কে বেছে নিতেন।

মসজিদে নববীর সাথে রাসুলের ঘর ছাড়া আরও অনেক সাহাবীর লাগোয়া ঘর ছিল। সেটা দিয়ে মসজিদে নববীতে সরাসরি প্রবেশ করা যেত। রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন কেবলমাত্র আবু বকর রাঃ এর দরজায় খোলা থাকবে আর বাঁকিগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। অনেক মনে করেন আল্লাহর রাসূল সাঃ এর মাধ্যমে আবু বকর রাঃ খলিফা হিসেবে নির্বাচনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের তিনি আশঙ্কা করতেন

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উম্মত খ্রিস্টানদের অনুসারী হতে পারে। তাঁর মৃত্যুর চার দিন আগে তিনি এই ওসিয়ত করে যান

তিনি বলেন জাযিরাতুল আরব থেকে তোমরা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের বের করে দিবে আর প্রতিনিধি দলের সাথে আমি যেমন ব্যবহার করতাম তেমন ব্যবহার করবে। তিনি ইসলামের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। সেখানে অন্য ধর্মকে স্থান দিতে চান নি।

তিনি আরো বলেন আল্লাহর লানত ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টানদের প্রতি, তারা তাদের নবীদের কবরের উপর মসজিদ বানাচ্ছে। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছে।

তিনি নিষেধ করেছেন এবং অপছন্দ করতেন কবরস্থানকে এবাদাতের জায়গা না বানাতে। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে রাসুল সাঃ সালাতের কথা বলেছেন। তিনি নারীদের ব্যাপারে বলেছেন তাদের উপর যেন অবিচার না করা হয়। আর জিহাদের ব্যাপারে বলেন

মানুষ যখন জিহাদ ছেড়ে দেবে তখনই অপদস্ত হবে।

তিনি মৃত্যুর চার দিন আগ পর্যন্ত ও সালাতের ইমামতি করেছেন। এশার ওয়াক্তে তাঁর শরীর এতটা খারাপ হয়ে যায় যে, তিনি উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। বারবার বেহুশ হয়ে পড়ছিলেন। পরে আবু বকরকে দায়িত্ব পালন করতে বলেন। রাসুল সাঃ অসুস্থ হলে সূরা ফালাক ও নাস পড়ে ফু দিয়ে শরীর মুছে নিতেন। কিন্তু তিনি এবার এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে আয়েশা রাঃ সূরা পড়ে রাসুলের হাতে ফু দিয়ে তাঁর হাত দিয়ে শরীর মুছে দিতেন। কারণ রাসূলের হাত বেশি বরকত ময়। মৃত্যুর দুদিন আগে তিনি একটু সুস্থ বোধ করছিলেন। আবু বকর রাঃ সালাতের ইমামতি করছেন। আর

রাসূলকে দেখে তিনি সরে আসতে চাইলে রাসূল সাঃ তাঁকেই থাকার ইঙ্গিত দিলেন। আবু বকর রাঃ তখন সালাতে রাসুলের অনুসরণ করলেন। আর বাকিরা আবু বকরের অনুসরণ করে সালাত আদায় করলেন। দিনটি ছিল সোমবার। আবু বকর রাঃ ফজরের ওয়াক্তের সালাত পড়াচ্ছেন। রাসুল সাঃ ঘরের পর্দা সরিয়ে তাঁর উম্মাতকে দেখছেন। মন প্রাণ ভরে যে দৃশ্য দেখার জন্য তিনি এতদিন সংগ্রাম করেছেন, তা যেন দেখছেন প্রাণভরে। তিনি মুচকি হাঁসলেন। তাঁর হাসি দেখে সাহাবিরা ও আনন্দে আত্মহারা। আনাস ইবনে মালিক বলেন

আল্লাহর রাসূলের মুখ সেদিন যেন কুরআনের পাতার মতো ঝলমল করছিল।

অন্য বর্ণনায় এসেছে

তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ফালি চাঁদ।

তিনি তাঁর উম্মাহর সর্বশেষ দৃশ্যটি দেখেছেন সেটি ছিল সালাতের জামাত। সোমবার ফজরের সালাহ ছিল তার শেষ সালাহ। তিনি মেসওয়াক এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু সেটা ব্যবহার করার সামর্থ্য ছিল না। আয়েশা রাঃ তাঁর চাহনি দেখে বুঝতে পারলেন, যে তিনি এটা চাচ্ছেন।তারপর মেসওয়াক নিয়ে তার অন্য প্রান্ত নরম করে রাসূলের কাছে এগিয়ে দিলেন।জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ও তিনি মেসওয়াক ব্যবহারের সুন্নাত ত্যাগ করেননি। রাসূলের যন্ত্রণা ক্রমে বাড়তে থাকে। ফাতিমা রাঃ দেখে বললেন আমার বাবার কতটা কষ্ট হচ্ছে। তিনি সেই মুহূর্তে উত্তর দিতেন আজকের দিনের পর তোমার বাবার আর কোন কষ্ট নেই মা।

মৃত্যুর মুহূর্তে তিনি আয়েশা রাঃ এর কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন। পানির পাত্রে হাত ভিজিয়ে বারবার মুখ মুছে বলছিলেন আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, নিশ্চয়ই মৃত্যু বড়ই কঠিন।

তিনি মানবজাতির শ্রেষ্ঠ হয়েও তাঁকেও মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। রাসুল সাঃ শেষ সময়ে সূরা নিসার একটি আয়াত পড়ে দোয়া করে বলছিলেন

হে আল্লাহ আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন নবী সিদ্দিক শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের সাথে যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার উপর রহম করো আমাকে সর্বোচ্চ সাথীর সাথে মিলিত কর। তাঁর চোখের পাতা ভারি হয়ে গেল, তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং ফিরে গেলেন তারপর সর্বোচ্চ সাথীর কাছে।

দাফন কাফন

মুসলিম উম্মাহর জীবনে যেন এ এক আকস্মিক বিপর্যয়। এ বিপর্যয় সামলে ওঠার শক্তি মনে হচ্ছে সবাই হারিয়ে ফেললেন। সবাই নির্বাক,উঠে দাঁড়ানোর শক্তি নেই,মনে হচ্ছিল সবাই বিশ্বাস করতে ও পারছেন না।সাহাবীদের জন্য এটা বিশ্বাস করা সবচেয়ে কষ্টের ছিল কারন, তিনি ছিলেন তাঁদের বন্ধু সবসময়ের সাথী,তাঁদের অভিভাবক। উমার ইবনে খাত্তাব এটা কোনভাবেই মেনে নিতে পারলেন না। উমার বলে উঠলেন, না না আল্লাহর কসম রাসূল মারা যাননি তিনি তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেছেন, মুসা আঃ যেমন তাঁর রবের সাথে দেখা করতে ৪০ দিনের জন্য তাঁর সম্প্রদায়কে রেখে চলে গিয়েছিলেন।এরপর আবার ফিরে এসেছেন। আল্লাহর রাসূল সাঃ তেমনি ফিরে আসবেন। অবশ্যই আসবেন আল্লাহর কসম করে বলছি আর ফিরে এসে তিনি তাঁদের হাত পা কেটে ফেলবেন যারা বলছে তিনি মারা গেছেন।তরবারির কোষ উন্মুক্ত করে অবুঝের মত উমার হুমকি দিয়ে বললেন

যে এ কথা বলবে যে রাসূল মারা গেছে আমি তার মাথা,এই তরবারি দিয়ে আলাদা করে দেবো।

এমন সংকটের সময়ও প্রচন্ড দুঃখ কষ্ট নিয়েও একজন ভেঙে পড়েননি তিনি ছিলেন রাসূলের শুরু থেকেই সব ঝড় রাসূলের সাথে সামলে নেয়া রাসূলের বন্ধু, ভাই, সাহাবী, আবু বকর রাঃ। রাসুলের ইন্তেকালের সময় আবু বকর মদিনায় ছিলেন না তিনি খবর পেয়ে আয়েশার ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসুলের শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল রাসুলের মুখ অনাবৃত করে আবু বকর কেঁদে উঠলেন। রাসূলকে চুমু দিলেন আর বললেন

আপনি জীবিত অবস্থায়ও পবিত্র ছিলেন। মৃত্যুর পরও আপনি পবিত্র। আল্লাহর কসম আল্লাহ আপনাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করাবেন না। এরপর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে মসজিদে চলে গেলেন।

সবচেয়ে কাছের মানুষকে হারিয়েও তিনি ঈমানী শক্তিতে নিজেকে সামনে নিয়েছিলেন। সেখানে উমার চিৎকার করছিলেন। আবু বকর রাঃ বললেন উমার বসো। উমার আবু বকরের কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আবু বকর আবার বললেন উমার বস বলছি। বস। তবুও উমার থামলেন না আবু বকর উমারকে ছেড়ে তখন সামনে এগিয়ে

গেলেন। লোকেরা উমারকে ছেড়ে আবু বকরের কাছে ভিড় জমালেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন

যে মুহাম্মাদের এবাদত করে সে জেনে রাখুক মুহাম্মদ মারা গেছে, আর যে আল্লাহর ইবাদত করে সে জেনে রাখুক আল্লাহ চিরঞ্জীব। তাঁর মৃত্যু নেই।

এরপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু নয় তাঁর আগেও অনেক রাসুল গত হয়েছে, তাই যদি তাঁরও মৃত্যু হয়, তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে। যারা পিছনে ফিরে যায় তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। শীঘ্রই আল্লাহ কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।(সূরা আল ইমরান)

কথাগুলো শুনে উমার বসে পড়লেন। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। তাঁর ভাষায় আমি বুঝতে পারলাম আল্লাহর রাসূল আসলেই আর নেই।

ইমাম কুরতুবি মন্তব্য করেন

সাহসিকতার মানে যদি হয় বিপদ আর কষ্টকর পরিস্থিতিতে দৃঢ় আর অবিচল থাকা তবে আবু বকরের সাহসিকতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো কুরআনের এই আয়াত ও এই ঘটনা। রাসুলুল্লাহর মৃত্যুর চাইতে বড় ফিতনা এই উম্মাহর জীবনে আর ছিল না। চারিদিকে যখন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম তখন তিনি হাল ধরেছিলেন। তিনি ছিলেন আবু বকর।

রাসুল সাঃ এর শিক্ষা দেয়া সবগুলো আমল তিনি করেছিলেন। এজন্যই তিনি হলেন নবী রাসুলদের পর শ্রেষ্ঠ মানব।

রাসুলের পরিবারের সদস্যরা তাঁর দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন, আল আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব, আলী ইবন আবি তালিব, আল ফাযাল ইবন আব্বাস,কুসাম ইবন আব্বাস,উসামা ইবন যায়েদ এবং রাসুল্লাহর আযাদকৃত দাস শুকরান।আনসারী সাহাবী আওস ইবন খাওলী আলিকে বলেন আল্লাহর কসম এবং রাসুলুল্লাহর উপর আমার হকের দোহাই দিয়ে বলছি আমাকে ভেতরে আসতে দিন। তাকে ভেতরে আসতে দেয়া হলো এবং তিনি গোসলের সময় উপস্থিত ছিলেন। আয়শা রাঃ বলেন, গোসলের সময় তারা বলল আমরা তো বুঝতে পারছি না রাসুলুল্লাহর

গায়ের কাপড় কি খুলে গোসল দেবো, যেভাবে করে আমরা অন্যদের গায়ের কাপড় খুলে গোসল দিয়ে থাকি। না কি কাপড় রেখে যেভাবে আছে সেভাবে গোসল দেবো। যখন তারা এটা নিয়ে বিতর্ক করছিল তখন আল্লাহ তাদের তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে দেন সে তন্দ্রায় তাদের প্রত্যেকের মাথা ঢলে পরল। এরপর ঘরের পাশ থেকে একটা আওয়াজ এল রাসূলুল্লাহর গায়ের কাপড় থাকা অবস্থাতেই তাকে গোসল দাও, কেউ জানে না এই কথা কে বলেছিল। তাই তারা রাসুলুল্লাহর জামার উপর দিয়ে পানি ঢালে এবং তারা তাদের হাত না দিয়ে জামার উপর দিয়ে তার শরীর ঘষে দেয়। গোসল শেষে তাঁকে জড়ানো হলো তিন টুকরো কাপড়ে। তাঁর জানাজার সালাত এক জামাতে আদায় হয়নি। আয়েশার ঘরে যতটুকু জায়গা হত ততটুকু তে মানুষ আসত তারা সালাত আদায় করে চলে যেত। এক দলের সালাত শেষ হলে আরেকদল এভাবে সালাত আদায় করা হলো। প্রথমে পুরুষরা, তারপর নারীরা, তারপর শিশুরা আর সব শেষে দাসরা। রাসূলুল্লাহর সালাতে কোন ইমাম ছিল না। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা সালাত আদায় করলো।ফজরের সময় হলে প্রতিদিনই বিলাল আযান দিত। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদুআন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলতে গিয়ে তাঁর গলার আওয়াজ জটলা পেকে গেল।তিনি আযান শেষ করতে পারলেন না। তিনি ভেঙে পড়লেন। রাসুলের মৃত্যুর পর তিনি আর কারো জন্য আযান দেন নি। আয়েশার ঘরে রাসূলের কবর খনন করা হলো। কারন নবীরা যে স্থানে মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই তাঁদের কবর দেয়া হয় এটাই নবীদের সুন্নাহ। আয়েশা রাঃ একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনটি চাঁদ তার ঘরে পতিত হয়েছে। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় আবু বকর রাঃ বলেন যে তোমার স্বপ্ন যদি সত্যি হয় তাহলে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ তিন ব্যক্তির ঘর তোমার ঘরে হবে। রাসূলুল্লাহ দাফনের সময় এলে আবু বকর বলেন তোমার চাঁদ গুলোর মধ্যে এটা হল সর্বশ্রেষ্ঠ চাঁদ। রাসূলের কবরস্থ করার কাজ তার পরিবারের লোকেরা সম্পন্ন করলেন। দাফনের কাজ শেষ করে সবাই ঘরে ফিরে এলো তখন আনাস রাঃ কে ফাতিমা রাঃ বললেন,

আনাস তোমরা কিভাবে পারলে আল্লাহর রাসূলের শরীরের উপর মাটি নিক্ষেপ করতে। রাসূলের মৃত্যু দাফন কাফন এগুলো সবই খুবই কষ্টের ছিল।

সেজন্য রাসূল সাঃ বলেছেন যখনই তোমাদের কারো উপর কোন বিপদ আসবে তখন আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে। কারন একজন মুসলিমের উপর সবচেয়ে বড় যে বিপদ আসতে পারে সেটা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। তা হলো আল্লাহর রাসূলের জীবন

অবসান। আর কোন মুসিবতি এর সাথে তুলনা করার মত নয়। মৃত্যুর একদিন আগে তিনি সব দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেন। সাত দিনার ছিল সেগুলো সাদাকা করে দেন। তাঁর একটি বর্ম এক ইহুদীর কাছে বন্ধক রাখা ছিল সেটার বিনিময়ে তিনি কিছু জব নিয়েছিলেন পরিবারের জন্য। তিনি রেখে গেছেন কেবল একটি সাদা খচ্চর, কিছু অস্ত্র আর এক টুকরো জমি। এই জমিটি ও তিনি মুসাফিরদের জন্য সদাকাহ করে দিয়েছিলেন। রাসুল সাঃ যেখানে শেষ করেছেন, সাহাবীরা সেখান থেকে নতুন যুগের সূচনা করেছেন। সেটাও এক গৌরবের ইতিহাস।

শেষ কথা

ছোট ছোট কিছু শব্দ মালায়, বইয়ের কয়েকটি পাতায়, কিংবা কয়েকটি কাগজের টুকরো তে এমন মহামানবের মহান, উজ্জল দৃষ্টান্ত গুলোর কতটুকুই বা লেখা যায়। সমস্ত প্রশংসা আমার সেই মহান রবের যিনি হাঁসি কান্না জড়ানো কিছু অনুভূতির মাধ্যমে,তাঁর হাবীব,তাঁর রাসুল, আমার রাসুল আমাদের রাসুল কে নিয়ে কয়েকটি কথা হলেও লেখার তাওফিক দিয়েছেন। আপনি আছেন আমাদের মাঝে ইয়া রসুল্লুল্লাহ,আপনি থেকে ও যেন নেই,আবার না থেকে ও যেন আছেন আমাদের সবটা জুড়ে, ইয়া রসুলুল্লাহ।আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা আমাদের কে আমাদের প্রিয় হাবীব সাঃ এর জীবন অনুসরন করার তাওফিক দান করুন। দরুদ ও সালাম নবী মুহম্মাদ সাঃ এর উপর।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهم بارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
হে আল্লাহ! আপনি (আপনার নিকটস্থ উচ্চসভায়) মুহাম্মাদকে সম্মানের সাথে স্মরণ করুন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে, যেমন আপনি সম্মানের সাথে স্মরণ করেছেন ইবরাহীমকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকে। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহামহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর বরকত নাযিল করুন যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহামহিমান্বিত।

গ্রনহ্ পন্জিকা

আর রাহীকুল মাখতুম -আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী

সীরাহ:- রেইড্রন্স মিডিয়া

খাতামুল আম্বিয়া:- মুফতী মুহাম্মদ শফি রহ:

আই ও এম কর্তৃক পাঠ্য রিসোর্স সমুহ

এবং অন্যান্য পুস্তক থেকে কিছু সংগৃহীত অংশ